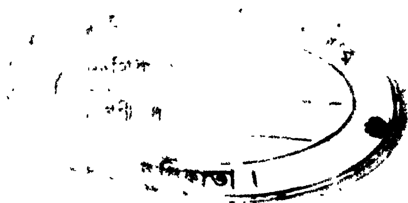
জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি



বঙ্গাব্দ ১৩১২



"We speak of the Volume of Nature; and truly a Volume it is,—whose Author and Writer is God. To read it! Dost thou, does man, so much as well know the Alphabet thereof? With its Words, Sentences, and grand descriptive Pages, poetical and philosophical, spread out through Solar System, and Thousands of Years, we shall not try thee. It is a Volume written in celestial hieroglyphs, in the true Sacred-writing; of which even Prophets are happy that they can read here a line and there a line."—*Natural Supernaturalism.*

মুখবন্ধ।

ইতঃপূর্ব্বে 'ধূমকেতু' নামক মাসিক পত্রিকায় 'মন্ত্র-জাগরণ', 'স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা' এবং 'জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ কয়টি নামে ভিন্ন হইলেও, উহারা একই উদ্দেশ্যাভিমুখিনী চিন্তার সূত্রে গ্রথিত। এই তিনটি প্রবন্ধই এখন একত্র-বদ্ধ ও বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, "জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি" নামে প্রকাশিত হইল। 'মন্ত্র-জাগরণ' এবং 'স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা' আমার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। সকলেই জানেন, অল্প বয়সের রচনার উপর স্বভাবতঃই মনের একটু অন্ধ আকর্ষণ ও অনুচিত পক্ষপাতিতা থাকে। এই কারণে, বহু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, উল্লিখিত প্রবন্ধ দুইটিতে স্থানে স্থানে ভাষায় অতিরিক্ত ঝঙ্কার ও শব্দাড়ম্বর রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান পাঠকবর্গের নিকট একটু শ্রুতি-কটু বোধ হইতে পারে। এতদ্ব্যতিরেকে সত্বর মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায়, স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। এজন্য ভুক্তভোগী মাত্রই, এমন কি, পাঠকবর্গের মধ্যেও অনেকেই

বোধহয়, মার্জ্জনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। গ্রন্থে যে জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য সরল উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎ-সমাজের বিচার-সাপেক্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩১২, ১৫ই আশ্বিন।
ঢাকা।

গ্রন্থকার।

জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি-রহস্য ও ক্রম-বিকাশ-নীতি।

পৃথিবীর মৃণ্ময় তনুতে মৃত্তিকা-স্তর; পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষে পাষাণ-স্তর; বায়ুমণ্ডলে—চিরপ্রবহমান বায়ু-প্রবাহে বায়বীয় তরল স্তর; জলদ-শরীরে,—মেঘ-মালার পটলে পটলে, বাষ্পীয় স্তর; ঊর্দ্ধ-দেশে,—ব্যোম-পথে, স্বর্গের পর স্বর্গের ক্রমোন্নত আনন্দময় স্তর; অধোদেশে,—অধঃপাতের পথেও আবার, পাতালের পর পাতালের অন্ধকারাচ্ছন্ন তিমির-স্তর। এ সকল বড় বড় পদার্থ ও ভাবাত্মিকা বৃহৎ কথা ছাড়িয়া দিয়া, ক্ষুদ্র মনুষ্যের সর্ব্বজনবিদিত ক্ষুদ্র শরীরটির প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, স্তরের পর স্তরের বিন্যাসেই মনুষ্য-দেহের আভ্যন্তরিক গঠন এবং ঐ সকল স্তরের শক্তি ও মাহাত্ম্যেই দৈহিক সামর্থ্য ও শোভার পরিস্ফূর্ত্তি। প্রথমতঃ শরীর-পঞ্জরে কঠোর কঙ্কাল-স্তর, তদুপরি মাংস ও পেশীর ঘনীভূত, অথচ অপেক্ষাকৃত কোমল স্তর; উহার উপরে শোণিতের তরল স্তর; সর্ব্বোপরি সচ্ছিদ্র রোমশ ত্বকের আবরণ-স্তর; এই ত্বক্‌ও আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য স্তরের একীভূত সমষ্টি

মাত্র। ইহার উপরে আরও একটি স্তর আছে; সে স্তর জড়াত্মক নহে,—ভাবাত্মক। তাহার নাম অন্তর্জ্যোতির বহিঃপ্রতিবিম্ব বা রূপের প্রভাময় প্রলেপ।

শুধু মনুষ্য সম্পর্কে নহে, মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর জীব, এমন কি কীট পতঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ কথা। ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গের ক্ষুদ্রতম তনুর তন্তু-বিশ্লেষ করিয়া দেখিলেও, ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব উপলব্ধ হইবে। স্তর-রচনা সৃষ্টির এক প্রধান ধর্ম্ম বা উপলক্ষণ। সৃষ্ট জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই স্তরের বিন্যাস পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ জড়-জগতেই স্তরের অনন্ত প্রকার দর্শকের চক্ষু আকর্ষণ করে। কিন্তু একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, দেখা যাইবে যে, স্তর শুধু জড়ের সহিতই সম্পৃক্ত নহে; উহা জড়কে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতর জগতেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ স্তর সর্ব্বত্র। যেমন জড়-জগতে, তেমন জীব-জগতে,—যেমন জীব-জগতে, তেমন ভাব-জগতে ক্রমোচ্চনীচ বিবিধপ্রকৃতিক স্তর দর্শন-দক্ষ নয়ন, মন ও কল্পনার সান্নিধ্যে প্রতিভাত হয়। মানুষ জৈবিক স্তর সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে অধিষ্ঠিত। জৈবিক স্তর-বিন্যাসের সহিত জীবনিবহের অন্তর্নিবিষ্ট চৈতন্য-কণার পরিমাণ ও বিকাশের সম্পর্ক। যে প্রাণীতে চেতনা-শক্তির যতটুকু বেশী স্ফূর্ত্তি, সেই প্রাণীর স্তর ততটুকু উর্দ্ধে অবস্থিত। সেই হিসাবেই মানুষের স্থান সকলের উপরে। জৈবিক স্তরে মানুষ যেমন সকলের উর্দ্ধ-

তম স্থানে বিরাজমান, মানুষের মধ্যেও আবার তেমন সামাজিক উচ্চ নীচ স্তরভেদে, উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিভাগ বিস্তর। এতদ্ব্যতীত মানবীয় মনোজগতেও, মনঃশক্তির বিকাশগত তারতম্য অনুসারে, উচ্চ নীচ গ্রাম বা স্তরের প্রকারভেদ অনেক আছে। সর্ব্ব-প্রকার মানবীয় স্তর বা শ্রেণী-বিভাগের মূল হেতু যে, আদিতে মনঃশক্তিরই বিকাশগত পার্থক্য, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ অবস্থা হইতেই প্রথমে শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিলেও, বংশ, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজ-নীতি সংক্রান্ত বহু স্বার্থ-প্রণোদিত কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রভাবে, উহার বহু প্রকার অঙ্গ-বিকৃতি ও স্বভাব-বৈকল্য সংঘটিত হইয়াছে। তথাপি বলি, মোটের উপরে, নিত্য-প্রত্যক্ষ মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও উহার অভিব্যক্তি, মনঃশক্তির বিকাশ ও অবস্থাগত পার্থক্যেরই পৃথক্ পৃথক্ ফল। এই গুরুতর বিষয়ের যৎসামান্য আলোচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

জগতের সর্ব্বাবয়বে কেবলই স্তরের সংস্থান দর্শনে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্তর-বিন্যাসে পদার্থের গঠন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য্য গতি বা প্রকৃতি। সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে ও প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে স্তরের অস্তিত্ব নিত্য-পরিলক্ষিত ও নিত্য-পরীক্ষিত বিষয় হইলেও, জগতের সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে জনসমাজে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। একদেশে, পুরাণ এক তত্ত্বের অব-তারণা করিতেছে; আর একদেশে কোরাণ আর এক কাহিনী কহিতেছে; এবং তৃতীয় আর একস্থানে বাইবেল সৃষ্টি-প্রকরণের

তৃতীয় আর একটি কথা লইয়া উপস্থিত হইতেছে। সৃষ্টি-প্রকরণের এইরূপ বিভিন্ন কাহিনী দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানুষের অনুসন্ধিৎসা মনুষ্য-সৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতেই এই দুরূহ তত্ত্বের প্রকৃতি-নির্ণয় ও সারোদ্ধারকল্পে প্রতিনিয়ত ক্রিয়ান্বিত রহিয়াছে; এবং এই অনুসন্ধিৎসার সন্ধুক্ষণেই সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ-চেষ্টা, সকল দেশে, সকল কালেই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে।

মানব-প্রাণের স্বাভাবিক জ্ঞান-তৃষ্ণাই এই অনুসন্ধিৎসার মূলীভূত কারণ ও আদি প্রবর্ত্তক হেতু। মানুষ সর্ব্বপ্রথম নয়ন উন্মীলন করিয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলরূপ অসীম চন্দ্রাতপ-তলে সরিৎ-সাগরাম্বরা, পাহাড়-পর্ব্বত-বন্ধুরা, তরু-লতা-মণ্ডিতা ও ফুল-ফলালঙ্কৃতা ধরিত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, আর বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন করিয়াছে,— "এ সকল কি? —এগুলি কোথা হইতে আসিল? কে সৃষ্টি করিল?" যেমন প্রশ্ন হইয়াছে, তেমন প্রত্যেকেই আপন আপন জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা, যুক্তি এবং অনুমানের অনুরূপ অনুসন্ধানের পথ লইয়া, এই সকল প্রশ্নের এক একটা মীমাংসা করিয়া লইয়াছে। এই সকল মীমাংসাই কালে সূত্রবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত হইয়া, সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে এক একটি কাহিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; এবং এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত এক একটা সৃষ্টি-রহস্যরূপে সেই ধর্ম্মের অঙ্গে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্ত সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যায় যুক্তির অংশ বড় কম; অনুমান ও কল্পনার ভাগই বেসী। কোন প্রমাণ-সিদ্ধ দার্শনিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, এই তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কিন্তু অনুমান, অনুমিতি ও যুক্তিবলে, ইহার এক একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না হইয়াছে, এমনও নহে। আমরা এক্ষণে তৎসম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিয়া মূল বিষয়ের অবতারণা করিব।

ভারতের পুরাতন আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদিগের মনোময় বিজ্ঞান-নেত্রে জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান-তৃষাকুল দৃষ্টি, জগতের জড়-শরীরের তত্ত্ব লইয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহারা জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উপেক্ষায় রাখিয়া দিয়া, জগতের প্রাণ-দেবতার অনুসন্ধানে ধ্যান-মগ্ন রহিয়াছেন; এবং সকল সত্যের সার সত্য সর্ব্বময় অতীন্দ্রিয় সজীব শক্তির সত্তা অনুভব করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বলাভের নিমিত্ত আজন্ম কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাঁহারা আত্মার সেই আনন্দময় অমৃতের স্বাদ-গ্রহণ-কামনায় বহু সাধনালব্ধ অলোকসাধারণ প্রতিভাকে মানবীয় জ্ঞানের চরম অনুশীলনে রত রাখিয়াছিলেন, অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রত্যক্ষদ্রষ্টৃরূপে সম্মানিত সেই ত্রিলোক-পূজ্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রলয়কালে, তমোময়ী প্রকৃতিতে লীন ছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন,—তখন উহা প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-জ্ঞানের অতীত

ছিল। কালে প্রকৃতির এই প্রগাঢ় প্রসুপ্তি, এই ঘোর তমসান্ধ অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথমে বুদ্ধিরূপ ব্যক্ত পরিণামের স্ফূর্ত্তি ঘটে। এই মহাপ্রলয় সময়েও, মুক্ত ও অমুক্ত এই দ্বিবিধ জীবাত্মা বর্ত্তমান ছিল। মুক্ত জীবাত্মানিচয় ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মে বিলীন ছিলেন; এবং অমুক্ত জীবাত্মাসমূহ সগুণা প্রকৃতি. কিংবা মায়াপন্ন পুরুষ বা পরমেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন।

প্রত্যেক অমুক্ত জীবাত্মার সহিত তাহার পূর্ব্বকর্ম্মজনিত বাসনা-বিলসিত বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির সহিত চিত্তের (পুরুষের) অভেদ-বোধ অক্ষুণ্ণ হইয়া রহে। ঈদৃক্ বুদ্ধি-সমুদ্ভূত অহঙ্কার.. পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির অদ্বিতীয় পরিচালক মন এবং এতদ্ব্যতীত পঞ্চ ভূতের উপাদানীভূত পঞ্চতন্মাত্রও তাহার সহিত বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃতি বাসনার অনুরূপ পঞ্চতন্মাত্র পরিপোষণ করিয়া পঞ্চ- ভূতের উৎপাদন করেন। এই পঞ্চভূত হইতে, বাসনা অনুসারে, যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ প্রাদুর্ভূত হয়।

পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। তিনি অপরিণামী, অকর্ত্তা ও সুখ- দুঃখাদিশূন্য। অমলা মূলপ্রকৃতি আপনি জড় হইলেও, চৈতন্য- স্বরূপ পুরুষের সহযোগে সংসার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারাই বিশ্ব- ব্যাপার সমুৎপন্ন হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এইরূপ প্রলয় এবং উদয়, পর্য্যায়ক্রমে, রাত্রি ও দিবার ন্যায়, সংঘটিত হইতেছে। যিনি পূর্ণ—যিনি

পূর্ণব্রহ্মসনাতন, তাঁহাতে কোন অভিনব ভাবের সদ্ভাব এবং নূতন কোন কর্ম্মারম্ভ অথবা নূতন সৃষ্টির বাসনা বা বিকার-সমুৎপত্তির কোন কারণই সম্ভবপর নহে। অভাবই বাসনার জনয়িতা। যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে আবার কি অভাব থাকিতে পারে? বস্তুতঃ, জগতের উদয় ও লয়রূপ উল্লিখিত অবস্থাদ্বয়, অনাদি ও অনন্তভাবে, পর্য্যায়ক্রমে, পুনঃ পুনঃ সংঘটিত ব্যাপার।

জগৎ-সৃষ্টির ঋষি-কথিত এই অতল ও অপার রহস্য-তত্ত্ব আমাদিগের ন্যায় সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি জীবের নিতান্তই অনধিগম্য। অস্মদ্দেশীয় মনীষিগণ চিন্তা ও জ্ঞানের চরম স্তরে আরোহণ করিয়া এতৎসম্পর্কে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠক! এখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং উহার আধার, আশ্রয় ও আদি কারণকে দূর হইতে বিস্ময়-বিমূঢ়-প্রাণে বারংবার প্রণিপাত করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞান এই তত্ত্বের কিরূপ মীমাংসা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে গুটি কএক কথা বলিব।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ সমস্ত জগতের সৃষ্টি রহস্যোদ্ভেদরূপ দুঃসাহসিক অসীম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, একমাত্র পৃথিবীর উৎপত্তি-রহস্য ব্যাখ্যা দ্বারা জগতের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদিগের এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী জগজ্জীবন সবিতা হইতে উৎপন্না। এক সময়ে, পৃথিবীর অণু-পরমাণু-রূপী সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ সূর্য্যমণ্ডল হইতে স্খলিত হইয়া, মহা ব্যোমপথে বাষ্পীয় অনল-পিণ্ডরূপে

ভ্রাম্যমাণ ছিল। এই বাষ্পীয় পিণ্ড বহুযুগ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার পরে, অনলময় তরল-গোলকে পরিণত হয়। যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতে থাকিল, কিন্তু এই অনল-গোলকের ভ্রমণে বিরাম ঘটিল না। ভ্রমণ-বেগে উহা ক্রমে শীতল ও ঘনীভূত হইয়া, অবশেষে মেদিনীরূপে বিকশিত এবং তরুলতাদির উৎপাদন ও প্রাণী-নিবহের জীবন-যাপন-যোগ্য সুখ-নিকেতন,—কর্ম্ম-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আরও বলেন,—বর্ত্তমান সময়ে, আমরা পৃথিবীকে যে অবস্থায় পরিণত দেখিতে পাইতেছি, ইহা একদিন বা এক শতাব্দীর ফল নহে। বহু সহস্র যুগ হইতে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুশাসনে, ভূপৃষ্ঠে ক্রমে স্তরের পর স্তর-সঞ্চারে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুচিয়াছে। পৃথিবী সম্বন্ধে যে কথা, সমস্ত জগৎ সম্বন্ধেই সেই কথা। সৃষ্টি ক্রীড়াময়ী প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়ারই অবশ্যম্ভাবি ফল।

বিজ্ঞানবিদ্ তাত্ত্বিকগণ, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রভৃতির আকৃতি, প্রকৃতি ও গতি পর্য্যবেক্ষণ এবং সূর্য্য ও গ্রহসমূহ কি কি উপাদানে গঠিত, তদ্বিষয়ক আলোচনা দ্বারা সৌরজগতের যুক্তি-সম্মত আনুমানিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহারই নাম জ্যোতিঃশাস্ত্র।' এই তত্ত্বে যাঁহারা তাত্ত্বিক তাঁহাদিগের নাম জ্যোতির্ব্বিদ্। পৃথিবীর মূল উপাদান, ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগ, পৃথিবীর পরিবেষ্টক জল ও বায়ুর কর্ম্ম ও উপাদান, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা, যে সমস্ত কারণে মৃত্তিকা দৃঢ় প্রস্তরে পরিণত হয়, এবং

পৃথিবীর জল ও স্থল-বিভাগে পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সমস্তই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, এই সমস্ত এবং যে সকল উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর কঙ্কাল ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সমস্তের আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা দ্বারা যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর হইলেও, মানবীয় বুদ্ধির অনধিগম্য নহে। আর্য্য ঋষিগণ, তাঁহাদিগের অতীন্দ্রিয় মনঃশক্তিবলে, বাহ্যজগতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, জগতের প্রাণ-দেবতার অন্বেষণে উদ্ধতম গ্রামে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের অধিকাংশই সেই প্রাণ-দেবতাকে অজ্ঞেয় ও অনন্ত জ্ঞানে দূর হইতে নমস্কার করিয়া, মাটীর মানুষ, মাটীর তত্ত্বেই মনো-নিবেশ করিয়া পরিতৃপ্ত রহিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং জড়-শরীরের তন্তু বিচ্ছেদ দ্বারা জগৎ-যন্ত্রের অনন্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানানন্দে ভাসিয়া গিয়াছেন। আমরা জীবনের স্তর-নির্দ্দেশ ও তাহার অভিব্যক্তি বিষয়ে প্রধানতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা-লব্ধ বিজ্ঞান-সূত্রের উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে চেষ্টা করিব।

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষিগণ যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরস্পর ঘোরতর বিরুদ্ধ বা একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন মতের অবতারণা ও সমর্থন করিয়াছেন, আমরা সে বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া একটা অভিনব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার বৃথা প্রয়াসে ধৃষ্টতা

প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। সে শক্তিও আমাদের নাই। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হইতে হইলে, আমরা অল্পাক্ষরে উভয় মতের উল্লেখ মাত্র করিয়া, সসম্ভ্রমে এক পার্শ্ব দিয়া সরিয়া পড়িতে যত্ন করিব। কিন্তু যে বিষয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই, আমরা অম্লানবদনে তাহা ধ্রুব সত্য জ্ঞানে গ্রহণ এবং যে তত্ত্বে প্রাচ্য নীরব, একমাত্র প্রতীচ্যই যাহার ভাষ্য-কর্ত্তা, প্রয়োজন পড়িলে, তাহারও অনুসরণ করিব। এই অনুসরণ কার্য্যে আমরা অবশ্যই অন্ধের মত পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করি না। কারণ, আধুনিক বহু বৈজ্ঞানিক সত্য এখনও নিত্য নূতন পদ্ধতির অনুসন্ধান ও গবেষণার অধীন রহিয়াছে। আজ যাহা বহুযুগব্যাপি বহু গবেষণার পরে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে, কালই হয়ত, আবার তাহা নূতন পরীক্ষার নূতন আবিষ্কারে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন ও বৈজ্ঞানিক সত্যের নির্ঘণ্ট হইতে নিষ্কাসিত হইয়া যাইতেছে। যাহাতে ঈদৃশ অপক্ক বৈজ্ঞানিক সত্যের টল্‌টলায়মান অস্থায়ি ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, বিপন্ন হইতে না হয়, যতদূর পারা যায়, আমরা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিব।

ভূ-তত্ত্ববিদ্ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ, বহুযুগব্যাপি পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা দ্বারা ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা স্থির বৈজ্ঞানিক উপপত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই উপপত্তি সাহায্যে, ভূ-পঞ্জর ভেদ করিয়া, তাঁহারা উহার স্তর-রহস্য পর্য্যালোচনা এবং স্তরের প্রকৃতি-পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর একটা আনুমানিক বয়ঃপরিমাণও

অবধারণ করিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীর এই বৈজ্ঞানিক বয়ঃপরিমাণ ও পৌরাণিক বয়ঃপরিমাণ এক কথা নহে। বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর কমঠ-কঠিন দৃঢ় আবরণরূপ যবনিকার অন্তরালে প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অতীত কালের যত্ন-সঞ্চিত স্তর-পটলে মুদ্রিত সাঙ্কেতিক লেখা পাঠ করিয়া, বস্তুতঃই বড় বিস্ময়কর প্রণালীতে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস প্রকাশ করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন। অতি পুরাতন সমুদ্রের তলদেশস্থ বস্তুনিচয় মৃত্তিকার একটা স্তরের নীচে লুক্কায়িত, আবার সেই মৃত্তিকাস্তরের উপরিভাগে বিলুপ্ত হ্রদের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন বর্ত্তমান, এবং এই সমস্তের উপরে, সেখানে যে কোন সময়ে, সমুদ্রের লবণাম্বু কল্লোলিত হইত, তাহার প্রমাণ-সূচক অনন্ত সামুদ্রিক বস্তু বিন্যস্ত রহিয়াছে: এই বিচিত্র অবস্থা দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা প্রথমতঃ বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়াছেন এবং তৎপর ঐ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, বিজ্ঞানের অঙ্গে অভিনব অধ্যায়ের যোজনা দ্বারা জ্ঞানের তহবিল পরিপুষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

পৃথিবীর বিগত অবস্থার প্রমাণ-লিপিস্বরূপ এই সমস্ত দৃঢ় বস্তুর মধ্যে কখনও বা দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ, কখনও বা ভস্মরাশি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হয়ত কোন কালে সেখানে এক ভীষণ আগ্নেয় পর্ব্বত বিদ্যমান ছিল। অনুসন্ধান-বলে, তাঁহারা ইহাও দেখিতে পাইয়াছেন যে, ভূ-গর্ভস্থ স্তরবিশেষে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক তরঙ্গের তটাঘাতজনিত চিহ্ন, কোথাও শুষ্ক জলাশয়ের কর্দ্দমাক্ত নিম্নদেশ, সূর্য্য-কিরণে

উত্তপ্ত হইয়া যে ভাবে ফাটিয়াছিল, ঠিক্ সেই 'ফুটি-ফাটা' অবস্থায়ই এখনও অবিকৃতভাবে অবস্থিত আছে; এবং বৃষ্টিপতনের প্রমাণস্বরূপ বারি-বিন্দুর মুদ্রণ-চিহ্নগুলিও তেমনই স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিলে দেখা যায়, যে সমস্ত স্থানে এই সকল চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, সেই সকল স্থানের তদানীন্তন প্রাকৃতিক অবস্থান এবং বর্ত্তমান সময়ের অবস্থানে অনেক পার্থক্য।

ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত আমূল তথ্য উদ্ধার-মানসে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা শুধু দেখিয়াই নিরস্ত হন নাই, ভূ-গর্ভের স্তরে স্তরে যে সকল তরুলতার ধ্বংসাবশেষ ও জীবজন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সকলের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া, ঐ সকল কি প্রকৃতির তরুলতা ও কিম্ভূত কিমাকার প্রাণীর ধ্বংসচিহ্ন, তাহাও অবধারণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে,— এক এক শ্রেণীর প্রস্তরমধ্যে এমন এক এক প্রকার জীবজন্তুর কঙ্কাল বা উদ্ভিদাদির ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে যে, তাদৃশ জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদি এক্ষণে ভূপৃষ্ঠে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু ইহাই নহে, বিভিন্নদেশীয় ঠিক্ একজাতীয় প্রস্তরমধ্যে অনুরূপ কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ এই মাত্র একস্থানে কোন বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীবের প্রকাণ্ড কঙ্কাল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার হয়ত এক বিলুপ্ত সমুদ্রের উৎক্ষিপ্ত ও সচ্ছিদ্র তলদেশ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়া লইতেছে। কোথাও বৃহৎ প্রস্তরের অঙ্গে প্রবাল-কীটের পঞ্জর লাগিয়া রহিয়াছে, এবং ঐ প্রস্তরই যে, একদিন ঐ সকল কীটের জন্মমৃত্যুর সূতিকা ও শ্মশান এবং সর্ব্ববিধ জীবন-ক্রীড়ার লীলাভূমি ছিল, অন্যান্য চিহ্ন দর্শনে তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কোথাও কয়লার খনি এবং সেই খনি-গর্ভে উৎপন্ন, কালে বিশুষ্ক ও মৃত নানাজাতীয় অসংখ্য তরুলতা একত্র জড়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বৃক্ষ-কোটরে মৃত টিক্‌টিকি ও শম্বুকের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব টুকুও বর্ত্তমান আছে। ক্রম-বিকাশ-বিধায়িনী প্রাকৃতিক ক্রিয়াই যে ভূগর্ভে ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, ভূপৃষ্ঠে যুগে যুগে নব নব বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে করিতে পৃথিবীকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়া পঁহুচাইয়াছে, এই সকল, অবস্থা-দর্শনে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ, পৃথিবীকে দূর ভবিষ্যতে আবার কিরূপ পদার্থে নিয়া পরিণত করিবে, তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু বর্ত্তমান যেমন দূর অতীতের প্রকার প্রদর্শন করে, তেমন ভবিষ্যতেরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

আজ যেখানে তুষার-মণ্ডিত অভ্রভেদি পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইতেছে, হয়ত বহু-যুগ-পূর্ব্বে সেই স্থানে, নীলাম্বুরাশির ভীম-গর্জ্জন ব্যতীত অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইত না। অথবা অদ্য যেখানে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার দৃষ্টির প্রান্তে ধূ ধূ করিতেছে, বহুযুগ পূর্ব্বে হয়ত তথায় সলিল-সম্পর্কশূন্য বালুকাময়ী মরুভূমি আপনার তাপ-দগ্ধ-শুষ্ক-বক্ষে মায়াবিনী মরীচিকার মায়া-সরোবর

সৃষ্টি করিয়া, উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী তৃষাতুর পথিককে মৃগতৃষ্ণিকার ফাঁদে ফেলিয়া প্রাণে মারিতে প্রয়াস পাইয়াছে। পর্ব্বতের পাষাণ-গাত্রে অগাধ বারিধি-বিহারী বিরাট জল-জন্তুর কঙ্কাল, সমুদ্র-গর্ভে স্থলচর জীবের প্রকাণ্ড পঞ্জর এবং মরুর দগ্ধ দেহে তুষার-বিহারী জীবের অস্থি, ইহা কল্পনা করিতেও চিত্ত বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়াবহ হইলেও, ইহা কবি-কল্পনার কথা নহে;—বিজ্ঞানের অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য। যে চরম-মঙ্গলাভিমুখী, ক্রম-বিকাশ-নীতি, অনন্তদেবের এই অনন্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে অবিশ্রান্ত নিয়মিত রাখিতেছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিশ্বাসের পথ আপনি উন্মুক্ত হইয়া আইসে। কারণ, দেখা যায়, যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত বিরাট বস্তুর প্রতি-অণুতেই সমষ্টির ধর্ম্ম অণুপরিমাণে নিহিত থাকে, অর্থাৎ বিরাট বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম যদি হয় ক্রম-বিকাশ,—উহার অণু-গুলি, অণুপরিমাণে হইলেও, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে। ভূপৃষ্ঠে, পর-পর স্তরসংস্থানের অনন্ত ব্যষ্টিতেও, কাজে কাজেই সমষ্টির ধর্ম্ম রক্ষিত না হইয়া পারে না। প্রকৃতি নীরবে অথচ অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় ও নিপুণতা সহকারে, ভূপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর বিন্যাস করিতেছেন। যেমন পৃথিবীর সমগ্র শরীরে ব্যাপক-ভাবে, তেমন সেই পৃথিবীর প্রত্যেক স্তরে আংশিক ভাবে, উহার গঠন-প্রক্রিয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, ক্রমবিকাশ-নীতির শক্তিই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। বস্তুতঃ, এই স্তরসংস্থান, বিভিন্ন অবস্থাযোগে ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্কুল

হইলেও যে একই ক্রম-বিকাশ-নীতির অঙ্গ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'।৮

আমরা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি বা বিবর্ত্ত-বাদের পক্ষপাতী হইলেও, উহার সমস্ত নির্দেশ ও উপদেশ শিরো-ধার্য্য করিয়া মানিয়া লইতে একটু সঙ্কুচিত ও ভীত। মানবজাতির প্রথম উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচ্য মনীষিগণ বা ঋষিসম্প্রদায় বলেন যে, সৃষ্টির অতি প্রথম সময়েই, মঙ্গলময় জগন্নিয়ন্তার সর্ব্বশক্তিমত্তা-প্রভাবে প্রভূতক্ষমতাশালী ও অলোকসাধারণ তেজঃসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তি প্রজা-সৃষ্টি ও জীব-জগতের কল্যাণ কামনায় সৃষ্ট হন। তাঁহাদিগের নাম প্রজাপতি। ভগবান্ তাঁহার ঐশীশক্তির সুমহান্ অংশ যদি তাঁহাদিগের ভিতরে ন্যস্ত না রাখিতেন, তাহা হইলে, তৎপরবর্ত্তী সময়ের অজ্ঞানান্ধ বা তিমিরাচ্ছন্ন অন্য মানব সম্প্রদায়ের জন্ম হইলেও, জগতে তিষ্ঠিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। সেই আদি সময়ে— সৃষ্টির সেই অননুমেয় অতীতকালে, সেই প্রারম্ভ-যুগে যেন ভগবানের হস্ত সৃষ্টি-কার্য্যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাপৃত হইয়াছিল ; এবং তদীয় সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের আংশিক আভা, তদানীন্তন মানবীয় প্রাণে পরবর্ত্তী মানব-নিবহের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে সুমহান্ প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ভগবৎ-প্রভা, নবীন ঊষার কিরণ-সম্পাতের ন্যায়, যুগান্তের প্রলয়-অন্ধকার দূর করিয়া যেন একবার মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকট হইয়া, অমনি প্রকৃতির আবরণে মানুষের পক্ষে, চির-নেপথ্যের পথে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সময়েই দেব-ভাষায়, মানবজাতির

উন্নতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বীজ-মন্ত্র স্বরূপ অপৌরুষেয় বেদের উদ্ভব হইয়াছিল। সৃষ্টির প্রথম সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ না করিলে, তাঁহাদিগের সাহায্য, সহানুভূতি, জ্ঞান, শিক্ষা ও দীক্ষার আংশিক সম্পদ্ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত না হইলে, পরবর্ত্তী বন্য-ভাবাপন্ন মনুষ্যগণের অস্তিত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানোজ্জ্বল সভ্যযুগের শুভ-সুপ্রভাত ঘটিবার পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। যেকালে যাহা প্রয়োজন, প্রকৃতি আপনা হইতেই তাহা যোগাইয়া আসিতেছেন, এবং প্রকৃতির সাহায্যে, স্বয়ং ভগবৎ-সৃষ্ট আদি মনুষ্যদিগের পরিত্যক্ত সেই প্রতিভার অঙ্কুর ক্রমে বিকশিত হইয়া, মনুষ্য-জগতের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান-ধৃত ক্রম-বিকাশ-নীতির এই অংশেই বিরোধ। ইহার পরবর্ত্তী কালের জন্য ঋষিরাও প্রকারান্তরে বিবর্ত্ত-বাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের এই মত যে অবরোহ-নীতিরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিপোষক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবরোহ-নীতির কথা পরে আলোচিত হইবে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মনীষিগণ এই অবরোহ প্রণালীর অঙ্গীভূত মতের সমর্থন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা বলেন যে, পশু হইতে ক্রম-বিকাশ-নীতি-বলে ক্রমশঃ মনুষ্যের বিকাশ ঘটিয়াছে। ডারউইন-কৃত বন-বিহারী হনুতে মনুষ্য উৎপত্তির সিদ্ধান্ত, অনেকেই অবগত আছেন ; এবং ডারউইনের এই মত, পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থলেই, অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। বানর হইতে মনুষ্যের আবির্ভাব, হিন্দু ঋষিদিগের

মতে একেবারেই সমীচীন নহে। ক্রম-বিকাশ-নীতি বা বিবর্ত্ত-বাদ আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বভাবে বীজ থাকিলে, ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়ায় অতি ক্ষুদ্র বস্তু হইতেও, তৎ-ধর্ম্মাক্রান্ত বিরাট্ বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে;—বল্মীক হইতে পর্ব্বত ও গোষ্পদ-বারি হইতে বিশাল বারিধির বিকাশ সম্ভবপর। কিন্তু বল্মীক হইতে সমুদ্র ও গোষ্পদ-বারি হইতে পর্ব্বতের উদ্ভব, অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। কোন বস্তুর স্বভাব বা মূল-প্রকৃতিতেই যদি বীজ না রহিল, তাহা হইলে, ক্রম-বিকাশ-নীতি যতই না কেন বলবতী হউক, কিছুতেই উহা হইতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির অঙ্কুর উদ্গম সম্ভবপর হইবে না। আদিম বন্য বর্ব্বর মনুষ্যের প্রাণে অননুমেয়ভাবে যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত ছিল, তাহা বানরের ভিতর থাকিতে পারে কি? তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে, ক্রম-বিকাশ-নীতি-বলে, বানর হইতে মানুষের আবির্ভাব কখনও সম্ভবপর নহে। ঈদৃক্ তত্ত্বের বিচার প্রায়শই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হয়। আমরা এরূপ অনুমানের পক্ষপাতী নহি। অস্মদ্দেশীয় মনীষী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই তত্ত্বে যে মতভেদ আছে, কেবল তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। মনুষ্য-সৃষ্টির মূল প্রস্রবণের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইত্যাদির ন্যায় আনুমানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান কর্ত্তৃক ক্রম-বিকাশ-নীতির যে অংশটুকু অনুমোদিত ও সমর্থিত, আমরা কেবল সেই অংশেরই অনুসরণ করিব।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, পৃথিবী যেমন ক্রমিক স্তরের পর স্তর সংযোগে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তেমন কি পৃথ্বী-চারী মানবও তাহার জাতীয় জীবনে ক্রমিক স্তর-সংস্থান-হেতু এই বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুচে নাই ? সাধারণতঃ, লোকের ধারণা যে, পৃথিবী প্রাণ ও চেতনাশূন্য একটা জড়-গোলক মাত্র। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জড় পরমাণুর অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম শেষ পরিণাম চৈতন্য-কণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীব-শরীরের একদিকে শারীর উপাদান, প্রত্যেক অণুর অন্তরতম প্রদেশে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চেতনা-বিন্দু সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ক্রিয়ান্বিত থাকে, তেমন অন্য দিকে সমগ্র জীব-বিগ্রহের অন্তর প্রদেশেও আবার সেই চেতনা-বিন্দুর সর্ব্বময় অধিনায়িকারূপে, স্বতন্ত্র আর একটা চেতনা-শক্তির সমষ্টি পরিস্ফুরিত রহে। জীবাত্মার ন্যায় পৃথিবীর অভ্যন্তরেও অধিকতর শক্তিশালিনী স্বতন্ত্র একটা চেতনা-সমষ্টি বিদ্যমান আছে কিনা, জানি না। কিন্তু উহার অণুতে অণুতে, অণু পরিমাণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চৈতন্য-কণা যে নিহিত আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং এই অর্থে ধরিত্রী চেতনাময়ী। উহার প্রত্যেক স্তরে, এবং প্রত্যেক স্তরের প্রতি অণুতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চৈতন্য-শক্তির কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর জড় অণুগুলি পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা হেতু, তন্নিষ্ঠ সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য একীভূত হইয়া, ক্রম-বিকাশ-নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এরূপ স্তরের পর স্তর যোজনা দ্বারা মাতৃ-ধৈর্য্যে চিরমৌনা

ধরিত্রীর অবিচ্ছেদে বর্দ্ধিত বিরাট্ অঙ্গে নিত্য নূতন পরিবর্ত্ত ঘটাইতেছে; এবং ধরিত্রী মোটের উপর ক্রমে বিকশিত ও আয়তনে সংবর্দ্ধিত হইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অণুর সমষ্টি স্তর, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সমষ্টি পৃথিবী। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির একস্থ সমষ্টি এক একটি মানব; এবং এই নশ্বর-স্বভাব ক্ষণ-ভঙ্গুর ভিন্ন ভিন্ন মানবের একীভূত সমষ্টি মানবজাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহ। এই বিরাট্ বিগ্রহও, পৃথিবীর মত, মোটের উপর ক্রমে বিকশিত ও ক্রমে সমুন্নত হইতেছে। তবে পাথক্য এই, পৃথিবীর বিকাশ জড়-তনুর আয়তন ও পরিসর বৃদ্ধিতে,—মানবীয় বিরাট্ বিগ্রহের বিকাশ, উহার মানসিক শক্তির পরিস্ফুরণে। মানবীয় বিকাশ উহার মানসিক শক্তির পরিস্ফুরণে যত, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে তত নহে। কিন্তু পৃথিবীর পরমাণুগুলি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট; সুতরাং একত্রবদ্ধ। উহার প্রত্যেক স্তরের বিকাশ ও পরিপুষ্টিতেই পৃথিবীর বিকাশ ও পরিপুষ্টি। মানবীয় বিরাট্ বিগ্রহ সম্বন্ধে একথা বলিবার উপায় নাই। উহার অঙ্গীভূত মানবনিচয় ভিন্ন ভিন্ন তনু-বিশিষ্ট স্বাধীনভাবাপন্ন স্বতন্ত্র জীব। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যকে একত্র গাঁথিয়া বিরাটের বিকাশ-বিধান ও উন্নতি-সাধনের উপায় কি?—সে সূত্র কোথায়?—পার্থিব স্তরের আকৃতি ও প্রকৃতি নিত্য-প্রত্যক্ষ সামগ্রী; কিন্তু মানবীয় বিরাট্ বিগ্রহের ক্রমোন্নতিবিধায়ক মানসিক স্তর কিরূপ পদার্থ, তাহা অবশ্যই কোন জড় চক্ষুর দ্রষ্টব্য বা বিচার্য্য নহে। আমরা যতদূর বুঝি, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যকে একত্র গাঁথিবার সূত্র চেতনা।

চেতনা ভিন্ন ভিন্ন আধারে ন্যস্ত থাকিলেও, মূলে অভিন্ন ও একই পদার্থ। চেতনার আণবিক সূত্র বর্ত্তমান ও অতীতকে এক শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া, স্থিতি ও মৃত্যুর ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া, বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সময়-সঞ্জাত প্রতি মানবের ভিন্ন ভিন্ন জীবন, ইথারীয় সংযোগ-সূত্রে একত্র সংশ্লিষ্ট রাখিতেছে, এবং স্থান ও কাল-মাহাত্ম্য-ভেদে ব্যক্তিগত ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত এক একরূপ মানসিক বিকাশই সমগ্র মানব-জাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের ব্যাপক বিকাশের পথে এক একটা মানসিক স্তররূপে গণ্য হইয়া রহিতেছে।

এই আণবিক চেতনা-সূত্র, স্মৃতি। স্মৃতি মানসিক শক্তিরই অংশবিশেষ। স্মৃতি আপনি জড় নহে। কিন্তু জড় ও অজড় উভয়ই ইহার ক্রীড়নক। কখনও ইহা জড়ের মুণ্ডমালা গলে দোলাইয়া শ্মশানচারিণী চামুণ্ডার ন্যায় অট্টহাস্যে পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলে, কখনও বা অজড়ের অমর-পুষ্পে চারু হার রচনা করিয়া, আশার মৃদুমধুর হাসিতে মানুষের ভয়-ত্রস্ত নিরাশ-হৃদয়ে শান্তি দান করিতে অগ্রসর হয়। জড়-জগতে জল হইতে বাষ্প সূক্ষ্ম;- বাষ্প হইতে বিদ্যুৎ সূক্ষ্মতর। আবার সেই বিদ্যুৎ হইতেও Electron বা বিদ্যুৎ-কণিকা আরও সূক্ষ্ম। সেই Electron বা বিদ্যুৎকণিকাও আবার ইথার হইতে স্থূলতর। জড়-জগতের এই সূক্ষ্মতম পদার্থ ইথার হইতেও, যদি সূক্ষ্মতর কোন কিছুর পরিচয় পাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে জড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া, অজড় মনোজগতে প্রবেশ করিতে হইবে। মন

কিংবা মানসিক শক্তি ইথার হইতেও সূক্ষ্মতর। চিন্তার শক্তি বস্তুতই অচিন্তনীয়। মানসিক শক্তির বিষয় আমরা মনেরই সাহায্য লইয়া চিন্তা করি! ইহা এক সঙ্গে আধার ও আধেয়,—আবাহন ও বিসর্জ্জন,—সুপ্তি ও জাগরণ! ইহা শত সহস্র যুগের অতীতকেও ক্রম-নবীভূত স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া, ইহার বিপুল গহ্বরে আশ্রয়দানে সমর্থ হয়। কিন্তু স্মৃতির নির্ভর-স্থল-স্বরূপ ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেলে, ভাবসমূহ বিস্মৃতির অন্ধকার-গহ্বরে চিরকালের তরে বিলীন হইয়া যায়।

মানুষের জাতীয় হৃদয়ে ক্রমশঃ স্তর-সংস্থান দ্বারা, ভগবানের ক্রম-বিকাশ বা ক্রমোন্নতি-নীতি, মানবের প্রকৃতিগত প্রয়োজন বা অভাববোধরূপ আবরণে গা ঢাকিয়া, স্মৃতির সাহায্যে কিরূপে বর্ত্তমান ও দূর অতীতের মধ্যে শৃঙ্খল-বদ্ধ সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিয়াছে; এবং দেশ, কাল ও পাত্রভেদে, মাত্রাগত প্রভেদ থাকিলেও, সমগ্র মানবজাতিকে কিরূপ ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করিতেছে, তাহাই এক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মানুষও, বোধ হয়, আদিম অবস্থায় পশ্বাদির ন্যায় এক এক রকম শব্দ করিয়া মনের হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও ক্রোধাদির ভাব ব্যক্ত করিত। স্বকীয় মনোভাব পরকীয় হৃদয়ে পরিস্ফুট করিবার আত্যন্তিকী ইচ্ছা, গভীর অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত সজল-জলদময় আকাশের বক্ষে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায়, স্ফুরিত হইলে, কালক্রমে ভাষার মুখে প্রথম কথা ফুটিয়াছিল; এবং জ্ঞানের তহবিল পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার তহবিলও ক্রমে

পুষ্ট হইতে হইতে হৃদয়ের ঘনান্ধকার অপসারিত করিয়া সম-প্রাণতা ও সমবেদনার জন্য একটা অভিনব পথ খুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যুগ-যুগান্তস্থায়ী অক্ষয় বটের মত প্রকাণ্ড পাদপ-নিবহের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র পল্লব ইত্যাদির সূক্ষ্ম উপাদান বা মূল কারণ যেমন ক্ষুদ্র-আয়তন সামান্য এক একটা বীজের অভ্যন্তরে, অননুমেয় ভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমন সভ্যতার বর্ত্তমান বা আপাত-চরম আলোকে উদ্ভাসিত মনুষ্য জাতির হৃদয়ে যে সকল উচ্চভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারও আদি উপাদান, উল্লিখিত বীজ-সন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড পাদপের মত, বন্য-ভাবাপন্ন আদিম মানবের হৃদয়-কন্দরেই অতি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল; সভ্যতার অঙ্গে কালে আরও যাহা ফুটিবে, তাহার বীজও আবার বর্ত্তমান সভ্য-ভাবাপন্ন মানবের প্রাণে তেমনই অবস্থায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। কালে ইহা ফুটিবে, কালে উহা মানুষকে আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইবে।

একটি লোক, মনে কর যেন, কলা-বিদ্যার কোন অঙ্গেরই কোন খবর রাখে না! শুধু খবর রাখে না, ইহাই নহে; সে কলা-বিদ্যার সহস্র ক্রোশ দূর দিয়া যাইতেও আজন্মকাল অনভ্যস্ত। এমন কি, তাহার ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও কেহ কলা-বিদ্যার কোন ধার ধারে নাই। এমন কোন নীচ শ্রেণীস্থ অশিক্ষিত অর্দ্ধ-বর্ব্বর মনুষ্যের কাছে যদি সুদক্ষ চিত্র-করের চিত্রিত একখানি আলেখ্য আনিয়া উপস্থিত করা যায়,

তাহা হইলে, চিত্র-নৈপুণ্যের কোন তত্ত্ব বুঝুক আর না বুঝুক, সে নিশ্চিতই আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রীতির সহিত বারংবার উহা দেখিবে, কখনও বা একটু বিস্ময়-বিমিশ্র, বিচিত্রভাবে উহার প্রতি নেত্রপাত করিবে এবং হয়ত চিত্রকরকে একটু বাহবা দিতেও সঙ্কুচিত হইবে না। কিন্তু সেই আলেখ্য খানিই যদি আবার, এই মানব-সমাজভুক্ত বর্ব্বরের পরিবর্ত্তে, পশু-জগতের চির-প্রখর একটা বন্য মর্কটের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার দর্শনে তাহার মনে এই শ্রেণীর কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে কি?—কখনই নহে। সে উহা হাতে পাওয়া মাত্রই অবলীলাক্রমে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। অন্য বস্তু হইতে আলেখ্যের অনন্যসাধারণত্ব তাহার মর্কট-বুদ্ধির স্বভাবতঃই অনধিগম্য। ইহাতে ইহাই বুঝা যায়, চিত্র-বিদ্যায় যে অলোকসাধাবণ প্রতিভা 'রাফেলের' প্রাণে শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া পড়িবার পথ পাইয়াছিল, তাহারই এক কণিকা, মানুষ বলিয়াই যেন, ঐ অর্দ্ধ-বর্ব্বরের চিত্তেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রসুপ্ত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা মানসিক শক্তি-সম্পদে মানুষ মাত্রেরই পশুর সহিত একটু বৈষম্য এবং নূন্যাধিক মাত্রায় হইলেও, মানসিক সম্পদ-সম্পর্কে, সকল মানুষের মধ্যেই পরস্পর একটু এক-ধর্ম্মিতার লক্ষণ প্রকাশ পায় না কি?

মানুষ যখন তাহার আদিম অবস্থার অন্ধকারে, শিশুজনোচিত অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, তখন সে মাতৃ-প্রতিম প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে করিতে এক একবার প্রকৃতির অঙ্গে মহাভাবোদ্দীপক

দৃশ্য দেখিয়া অননুভূত ও অচিন্তিত আকুলতায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। জগৎ-প্রাণ সবিতার জগদুজ্জ্বল মহতী মূর্ত্তি, অভ্রভেদী পর্ব্বতের সুবিশাল সমুন্নত দেহ, খরতোয়া স্রোতস্বতীর উচ্ছ্বসিত প্লাবন-বেগ, প্রকাণ্ড মহীরুহের স্থির-গম্ভীর ভাব, সে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া কি যেন অজ্ঞাত শক্তির অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশে, বারংবার, জানে না কাহার চরণে, আপনি প্রণত হইয়াছে, এবং এইরূপে তাহার তদানীন্তন চিত্তের আকুলতা আংশিক প্রশমিত করিয়া লইয়াছে। আদিম মনুষ্য,হৃদয়-স্থিত যে প্রবৃত্তির তাড়নায়, একীভূতা প্রকৃতির মহাপূজা ও তৎসংশ্লিষ্ট উচ্চ ভাব ধারণা করিতে অসমর্থ হইলেও, প্রাকৃতিক পদার্থ তরু, লতা, জল, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ মেঘ অথবা সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের কাল্পনিক চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; কালে, সেই অপ্রকট প্রবৃত্তি-প্ররোহই, বিকাশের পর বিকাশ লাভে, সুদুর্ল্লভ অমর-জ্যোতিতে বিলসিত হইয়া, মর্ত্ত্যধামে স্থানে স্থানে অমৃতের উৎসরূপে ফুটিয়া পড়িয়াছে!

বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে পরিস্ফুট, মানসিক সম্পদে সম্পন্ন মানবজাতির ভিতরে,—ব্যক্তিবিশেষের প্রাণে, সময় সময়, (Self) অহং-ভাবাপন্ন মানবাত্মা (Higher Self) যে প্রবরাত্মা রূপে বিকশিত হইয়া, মনুষ্য জাতিকে প্রেমের অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়াছে,—মরুর কঙ্কর-কঠিন প্রতপ্ত বক্ষে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়াছে, অজ্ঞানান্ধ আদিম জাতির প্রাণে সেই প্রবরাত্মাই, তখন মৃত্তিকা, অঙ্গার অথবা অন্য কোন অপরিষ্কার বস্তুর মিশ্রণে

একান্ত হীনপ্রভ ও মলিন, সদ্য-উত্তোলিত খনিজ স্বর্ণের ন্যায়, সময় সময়, আধ-পরিস্ফুট হইয়া, অপরিস্ফুট, অন্ধ ও নগ্না ভক্তির প্রণোদনায় ঐরূপে প্রকৃতির ক্রীড়নক জড়ের অবাস্তব-পদে প্রণাম করিয়াছে। মানব-হৃদয়ে জগন্নিয়ামক ধর্ম্মের উহাই প্রথম রশ্মি-পাত। আমরা এই (Higher Self) প্রবরাত্মার বিষয় পশ্চাৎ বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সেই আদিম সময়েও, মনুষ্য-নামধারী বন্য বর্ব্বরের প্রাণে এই প্রবরাত্মাই যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে, এমন কি, প্রায় অননুমেয় অবস্থায় রহিয়া, তৎকালোচিত বন্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে, গোমুখীর গুহা-নিবদ্ধ গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায়, অলক্ষ্যে কল্লোলিত ছিল, আপাততঃ তাহাই মাত্র বলিয়া রাখিলাম।

পৃথিবীতে ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর-সংস্থান মানবীয় চিন্তার অনধিগম্য অতিদূর অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সেই অনল-কণাময় বাষ্পীয় প্ররোহ যখন গ্রহরাজ সূর্য্যের তনু হইতে স্খলিত হইয়া ব্যোমপথে সর্ব্বপ্রথম ভ্রমণ-ব্রতে ব্রতী হয়, তখনই যেমন এই সমস্ত স্তরের উপাদান তাহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীভূত অবস্থায়ই ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমন মানব-হৃদয়েও, সৃষ্টির সময় হইতেই, (Lower Self) অবরাত্মার সহিত (Higher Self) প্রবরাত্মার বীজ এবং প্রবরাত্মা-সম্ভূত ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান (Instinct) নিহিত রহিয়াছে। মানুষের অভ্যন্তরে চির-স্বভাবসিদ্ধ অভাববোধ, স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যের আধিপত্য, এবং ভাষার প্রভাব, ইচ্ছা-শক্তি ও ইচ্ছা-

শক্তির অনুবলে ক্রমিক বর্দ্ধন-স্পৃহা ও তদনুযায়ী বর্দ্ধনশীল মানসিক সম্পদ্, এই সমস্ত, একই মনের তহবিলে, একত্র অবস্থিত এবং মানবীয় জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি-বিধায়ক স্তর উৎপাদনের হেতুরূপে লুক্কায়িত ছিল।

মানব-জাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি বিধায়ক স্তরের উপাদান লইয়া জগতে অবতীর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরাট্ বিগ্রহের বিকাশ বা জাতীয় জীবনের উন্নতি-বিধায়ক সেই সকল স্তরের গঠন ও স্ফূর্ত্তি কিরূপে সংঘটিত হইল, ইহাই তাত্ত্বিকের তত্ত্ব,—ভাবুকের চিন্তা, এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে আমাদিগেরও ইহাই আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবী যখন জীবজন্তুর কল-কোলাহলে প্রাণবতী এবং তরু-লতা ও ফল-ফুলের কমনীয় আভরণে কান্তিমতী হইয়াও অজ্ঞা-নতার গভীর অন্ধকারে লীন, মানুষ তখন বন্যভাবাপন্ন বনেচর মাত্র। তরু-কোটরে তাহাদিগের বাস, বন্যপশু হনন ও অপক্ক মাংসে উদর পূরণ তাহাদিগের কর্ম্ম। রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করিলেই অভাবের তাড়নায় নিপীড়িত হইতে হয়। দেহ-রক্ষার জন্য যাহা অত্যাবশ্যকীয়রূপে প্রয়োজনীয়, প্রকৃতি সর্ব্বাগ্রে সেই সকল অভাবের বিষয়ই একটু কঠোরতার সহিত বন্যজীবী আদিম মনুষ্যকে বিশেষভাবে অনুভূত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল। তখনকার সেই অজ্ঞানান্ধ শিশু মানবও, সেই অভাব মোচনার্থই আপনার তাৎকালিক বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। উদরে ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা, সেই জ্বালা

নিবারণার্থ মানুষ সর্ব্বপ্রথম গাছের পক্ক ও অপক্ক ফল খাইয়াছে, বনের পশু মারিয়া উহার শোণিত-বসা-সিক্ত আম-মাংসে উদর পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু মানুষ পশুর সহিত সমপদবীতে চিরদিন বিচরণ করিবার জীব নহে। সে শৈশবে অবস্থাবশে নগ্নদেহে বনে ভ্রমণ করিয়া বন্য বা বর্ব্বর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও, তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে আমিত্ব-জ্ঞান, অনন্ত অভাবের অনুভূতি ও সেই সকল অভাবমোচন-উপযোগিনী বুদ্ধির ক্ষীণ অঙ্কুর অথবা পুরুষকারের মুখাপেক্ষী ক্রমোন্নতির আদি-বীজভূত উপাদান নিহিত ছিল। ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে ক্রম-বর্দ্ধনশীল মানসিক সম্পদ্ একই আধারে নিত্য অবস্থিত। এই অবস্থার ফল এই হইল যে, বন্যজীবী বর্ব্বর নিত্য নূতন অভাব বোধ করিতে লাগিল; এবং সেই অভাব দূরীকরণ মানসে নিত্য নূতন পথে বুদ্ধিকে চালনা করিতে আরম্ভ করিল। অপক্ক ফল বা আম-মাংসে উদর পূর্ণ হয় বটে; কিন্তু রসনার তৃপ্তি ঘটে কৈ? সুতরাং, সুপক্ক ফল ক্রমে অপক্কের স্থান অধিকার করিয়া লইল। শোণিত-সিক্ত অপক্ক মাংস, অনল-তাপে আংশিক রূপান্তরিত হইয়া রসনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে শিখিল। বাস-গৃহ বৃক্ষের কোটর হইতে ক্রমে মাটীতে অবতরণ করিয়া কুটীরের মূর্ত্তি ধারণ করিল।

মানবীয় উন্নতির এই প্রাথমিক প্রয়াস কখনও সহজে সাফল্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, কখনও অর্দ্ধ-সাফল্যলাভে অথবা কালে সাফল্যলাভের আশা-মাত্র পোষণ-উপযোগী চিহ্নে আশ্বস্ত হইয়াই,

মানুষকে সভ্যতা ও উন্নতির মার্গে আরোহণার্থ উৎসাহী করিয়া তুলিল। স্থান-মাহাত্ম্য তাহার এই সভ্যতা বা উন্নতির স্রোতে এক বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

বস্তুতঃ মানবীয় উন্নতি ও সভ্যতার বিকাশ এক সময়ে একই মূর্ত্তিতে পৃথিবীর সকল স্থান ব্যাপিয়া এক সঙ্গে ঘটে নাই। স্তর-সংস্থানে পৃথিবীর বিকাশ যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইতে হইতে মোটের উপর এই পরিদৃশ্যমান। পৃথিবী ফুটিয়া পড়িয়াছে, তেমন মানবীয় উন্নতির স্তরও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত হইয়া, মোটের উপর মানবীয় বিরাট্ বিগ্রহের বিকাশ সাধন করিতেছে। উহার এক অঙ্গ যে সময়ে সমুজ্জ্বল রাজ-বেশে ঝলমল, সেই সময়েই আর এক অঙ্গ অনাবৃত ও নগ্ন অবস্থায় শীতবাতে জড়সর। উহার এক মুখে যখন সুপক্ক পলান্নের রুচিকর সৌরভ, সেই সময়েই আর এক মুখে শোণিত-সিক্ত অপক্ক মাংসের শোণিত-ধারা, অথবা অপক্ক পর্য্যুষিত বস্তুর ন্যক্কার-জনক দুর্গন্ধ! উহার একদিক্ বিকশিত হইয়াছে, আর একদিক্ অবিকশিত রহিয়াছে বা ঈষৎ বিকশিত হইবার সুযোগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার কোন আলোক-প্রাপ্ত উজ্জ্বল অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছে, অপর কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত তনু নূতন আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর বিরাটের গতি চিরদিনই উন্নতি ও ক্রম-বিকাশের দিকে। ভিন্ন ভিন্ন কাল ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মানবীয় উন্নতি বিকাশের পথে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য

করিয়াছে। কাল ও স্থানজ মাহাত্ম্য এবং মানবীয় সভ্যতার উপর উহাদের কার্য্যকারিতার বিষয়, আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা।

পার্থিব জড়ীয় স্তর, পার্থিব জীব-নিবহের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় বা জৈবিক স্তর এবং মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর, এসমস্তই ক্রম-বিকাশ-নীতি দ্বারা নিত্য নিয়মিত। কিন্তু এই সকল স্তরের প্রকৃতি, অবস্থা, বিকাশ, সকল স্থানে ও সকল সময়ে একবিধ নহে। এক এক স্থানে এক এক সময়ে এক এক রকম স্তরের সংগঠন ও বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমার ফল।

ঐ বিশাল-বপু ব্যোমের অনন্ত নীলিমা, কখনও অমল-স্নিগ্ধ ঊষার ললাটস্থিত, প্রকৃতির কর-নিবিষ্ট স্বর্ণ ও রজতের মিশ্র আভাময়ি, দিগন্ত-প্রসারিণী জ্যোতি-রেখার কেন্দ্রস্থলে, সিন্দূর-বিন্দু সদৃশ তরুণ-অরুণ-বিগলিত আলোহিত স্বর্ণচ্ছটার সঞ্জীবন-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া নিদ্রোত্থিত জীব-জগতের প্রাণে নূতন আনন্দ ও

নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিতেছে ; কখনও সন্ধ্যার দিগন্তশোভী, মহাবৈরাগ্যভাবের উদ্দীপক লোক-লোচনের সুখ-সহনীয় রক্তিম-রাগে আংশিক রঞ্জিত বহিয়া, যেন আরতির পবিত্র আবেশে ভক্ত ও ভাবুকের মন প্রাণ আর একদিকে আর একভাবে টানিয়া লইতেছে ; কখনও পূর্ণেন্দুর বিশ্ব-প্লাবিনী সুখ-স্মৃতির চির আবাহনী অমিয়-মধুরা জ্যোৎস্না-ধারায় আপনি উৎফুল্ল হইয়া, প্রফুল্লতার উচ্ছল প্রবাহ, জলে স্থলে ও স্থাবর-জঙ্গম-জগতে ঢালিয়া দিতেছে ; কখনও বিরহ-সন্তাপে বিশুষ্কীকৃত সুন্দরীর পাণ্ডুর-বদন-জ্যোতির ন্যায়, যেন একটু বিষাদ-মাখা, অনতি উজ্জ্বল অমল কিরণ-দীপ্ত ক্ষীণ শশি-রেখায় লাঞ্ছিত হইয়া, কোন সময়ে ভাবী-জ্যোৎস্নার আশ্বাসে বিষাদের মুখে আশার ক্ষণিক হাসি ফলাইতেছে, আবার কোন সময়ে, সম্মুখে অমার অন্ধকার, এই নিরাশ-সঙ্গীতে তান ধরিয়া, অসময়ে ঘুমন্ত পাখীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে ; এবং কখনও বা অমার তিমিরে গাঢ় মসী-লিপ্ত অথবা সাধক-হৃদয়ের প্রতিকৃতিস্বরূপ, অনন্তকালের সঙ্গীব ন্যায়, নীলবক্ষ-বিলাসী খদ্যোত সদৃশ অসংখ্য তারকা নিচয়ে পরিশোভিত রহিয়া, প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভীষণ সৌন্দর্য্যের এক বিচিত্র মাধুরীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিয়া জীব-জগতের প্রাণ স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছে। বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝটিকার মহারঙ্গ-ভূমি, ঐ অনন্ত-বিস্তৃত মহাব্যোম বা মহাশূন্যই আবার, এই অপরিমেয় বিস্তীর্ণ জীব-ধাত্রী ধরিত্রীকে উহার অঙ্কস্থিত অসংখ্য অদ্রি, সাগর, নদী, অরণ্য, নগর, মরুভূমি ও শস্য-শ্যামল-ক্ষেত্র সহ আবরিয়া রাখিয়াছে ; এবং

উহার সহিত শত সহস্র অকাট্য গাঢ় সম্বন্ধে নিত্য-বিজড়িত রহিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করি, ঐ অনন্ত-বিস্তৃত, অনন্ত বৈচিত্র্য-বিলসিত অসীম ব্যোম, আর এই মানবীয় ক্ষীণ দৃষ্টির পক্ষে অমেয় হইলেও, সীমাবদ্ধ অথচ বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রীর সকল স্থানেরই কি মাহাত্ম্য এক ?—সকল সময়ের সকল অবস্থারই কি মহিমা সমান ? স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও সকল স্থানের মাহাত্ম্য ও সকল স্থানের মহিমা এক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। তবে প্রথম ইহা মনে হইতে পারে যে, ইহার সকল স্থান সকল সময়েইত স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ মহিমায় নিত্য মহিমান্বিত। তবে উহার ভিতরে আবার মাহাত্ম্য বিষয়ে ইতর বিশেষ কি থাকিতে পারে ?

আরও একটি কথা আছে।— পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত জগদ্ব্যাপী অনন্ত স্থানের (space) এক এক অংশ অধিকার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পিণ্ডীভূত মূর্ত্তিতে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর আকৃতি, প্রকৃতি, গতি ও কর্ম্মগত পার্থক্য থাকিলেও, যেমন এ সমস্তই প্রায় এক উপাদানে গঠিত এবং ইহাদিগের অধিকৃত স্থানও (space) যেমন,স্থানরূপে মূলে একই পদার্থ, দিবা, রাত্রি ও ঋতুর পর্য্যায়ে প্রকারভেদ থাকিলেও, সমস্ত কাল তেমন, কালরূপে, মূলে একই বস্তু। অতএব স্থানের যদি কোন মাহাত্ম্য ও কালের যদি কোন মহিমা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে, সকল স্থানের ও সকল কালের মাহাত্ম্য

ও মহিমাই এক হইবে না কেন? স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। প্রকৃতিই ইহার উত্তর-দাত্রী। প্রকৃতির গতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারিবে।

সমগ্র জগতের মূল উপাদান ও শক্তি যদিও এক, কাল যদিও অনাদি ও অনন্তরূপে একই পদার্থ, তথাপি স্থানের ও কালের প্রকার ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য অশেষ ও অসংখ্য। আফ্রিকার সৌর-কিরণ-দগ্ধ সাহারা এক কথা, আর বাঙ্গালার শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধমাঠ আর এক কথা। হিমাদ্রির কাঞ্চনজঙ্গা বা ধবলশৃঙ্গ অতিমেঘমণ্ডলে মস্তক উত্তোলন করিয়া, স্থানের একবিধ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে; কাস্পিয়ান্ হ্রদের তট-ভূমি আর এক প্রকৃতির দৃশ্য বুকে লইয়া কাস্পিয়ান্ হ্রদোত্থিত তরঙ্গ গণনা করিতেছে। এইরূপ প্রভাত ও সন্ধ্যা, কাল হইলেও, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে বিভিন্ন; শীতের প্রভাত ও নিদাঘের প্রভাত একই কালের অঙ্গ হইলেও, প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মূল উপাদান এক বটে, কিন্তু বৈচিত্র্যই সৃষ্টির ধর্ম্ম, বৈচিত্র্যই উহার প্রকৃতি। এই বৈচিত্র্য যেমন স্থানের, তেমনই কালের অঙ্গে অঙ্গে নিত্য-প্রেক্ষণীয় বৈভব বা দৃশ্যরূপে চিরপরিস্ফুট।

মানুষের অভিধানে পৃথিবীর এক নাম অনন্তা। মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা পৃথিবীর অন্ত অবধারণে অসমর্থ। আমাদের পৃথিবী-রূপিণী সেই অনন্তাও কিন্তু অপার অসীম মহাব্যোমের তুলনায় একটা অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। অতএব, অমরা ঐ অনন্ত-

কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার ও আশ্রয় মহাব্যোমকে বিস্ময়-বিমূঢ়-চিত্তে অজ্ঞেয় ও অনন্ত-শক্তি ব্যোমকেশের পাদ-পদ্মে সপিয়া দিয়া, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ পৃথিবীর পানে তাকাইয়াই আমাদিগের বক্তব্য নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম কথা, মাহাত্ম্য শব্দটি। মাহাত্ম্য শব্দ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি ইতর জন্তুর কণ্ঠ-নিসৃত ধ্বনি বা অর্থ-শূন্য আরাব নহে,- -উহা সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, পরিজ্ঞাত জড়-জগৎ-স্থিত বস্তু পদার্থের ন্যূনাধিক প্রভু, ভাষা ও ভাবের অদ্বিতীয় অধিকারী, অন্বর্থক শব্দ-স্রষ্টা মনুষ্যের উদ্ভাবিত,—মনুষ্য-মস্তিষ্ক-সম্ভূত আভিধানিক সম্পদ্। সুতরাং, মাহাত্ম্য শব্দটিকে নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। 'স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা', এই বাক্যটি যদি মনুষ্যজাতি কর্ত্তৃক মনুষ্যের অনন্যজীব-সাধারণ বস্তু-লাংশে উচ্চতর বৃত্তি-সমূহের সম্যক্ বিকাশ ও সার্থকতার পথে কোন স্থান বা কালের অনুকূল অবস্থা বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া অযৌক্তিক বা অনর্থক বাগ্-বিন্যাসরূপে পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে, একটু চিন্তা করিলেই, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃত পক্ষেই, স্থানের মাহাত্ম্য ও কালের মহিমা আছে এবং সেই মাহাত্ম্য অনুসারে স্থান ও কালের শ্রেণী-বিভাগও হইতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ডে স্থান অনন্ত। স্থানের মাহাত্ম্যও অনন্ত। কিন্তু জড়-জগতের কাছে স্থানের মাহাত্ম্য থাকিয়াও না থাকার মত। স্থান-মাহাত্ম্য জীব-জগতেরই ভোগ্য, সেব্য ও অনুভব্য। শুধু সেব্য, ভোগ্য ও অনুভব্য এমন কথা নহে, স্থান-মাহাত্ম্য দ্বারা প্রতি-

নিয়তই জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষা ও বিকাশের প্রকার ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিত। জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষা ও মানসিক বিকাশের তারতম্য অনুসারে, স্থান-মাহাত্ম্যের যেমন অশেষ তার-তম্য বিঘোষিত হয়, তেমন স্থান-মাহাত্ম্যের তারতম্য অনুসারে জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষারও অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একথা বলার একটু তাৎপর্য্য আছে। কর্দ্দম-লিপ্ত সুখ-তৃপ্ত শূকর হয়ত পঙ্কাবশিষ্ট সরোবরকেই তাহার পুণ্য-তীর্থ বা মোক্ষ-ধামরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। পঙ্ক-সরোবর শূকরের পক্ষে দূষ্য হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের নিকট উহা কখনও তৃপ্তিকর অথবা না স্বাস্থ্য-সুখ-প্রদ নহে। আবার মনুষ্যের ভিতর যাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথবা যে টুকু আছে, তাহাও উল্লেখের অযোগ্য,—যাহারা নামে, আকৃতিতে ও পোষাক-পরিচ্ছদে মনুষ্য-পদবাচ্য হইলেও, মনুষ্য-ত্বের নিম্নতম গ্রামেও এ পর্য্যন্ত পঁহুচিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা কর্দ্দম-লেপজনিত, নিরামিষ-সুখ-তৃপ্ত শূকরের ন্যায় পঙ্কাবশিষ্ট সরোবরকে স্থান-মাহাত্ম্যে প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও, অনেক সময়ে, প্রাকৃত-জন-ভোগ্য নিকৃষ্ট বাহ্য চাকচক্য-মণ্ডিত, জীবনী-শক্তি কিংবা মনুষ্যত্ব-বিঘাতন অসার আমোদ কিংবা প্রদাহি সুখে জড়িত দুরিত-দুর্গন্ধময় ক্লেদপূর্ণ স্থানকেও হয়ত স্থান-মাহাত্ম্য-বিষয়ে উচ্চ আসন প্রদান করিত সঙ্কুচিত হইবে না। ইহা তাহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। কারণ, মাহাত্ম্য শব্দটি কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা তাহারা

আপনাদিগের নীচ আদর্শ হইতেই নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের মাহাত্ম্য-পদের প্রয়োগস্থল মহাজনদিগের প্রচলিত পদ্ধতি হইতে অন্যরূপ ; এমন কি, প্রায় বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। স্থানীয় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পাত্রভেদে এইরূপ বিচারভেদ ও প্রকারগত তারতম্য রহিলেও, স্থান-মাহাত্ম্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই বিচার বিতর্ক বা দ্বিধা কিংবা দ্বিরুক্তি থাকিতে পারে না। পঙ্ক-সরোবরে শূকরের আনন্দ-বিলাস—আর পদ্ম-সরোবর-বিলাসী মানুষের বিরক্তি ও বিকার ; দুরিত-দুর্গন্ধময় শবক্ষেত্রে গৃধিনীর উল্লাসময় উচ্ছ্বাস—আর ভীতি-বিমূঢ় মানবের ঘৃণা-ব্যঞ্জিত শীৎকার, সমস্তই স্থান-মাহাত্ম্যের ফল।

স্থানীয় মাহাত্ম্য দ্বিবিধ ;—স্বভাবজ ও কর্ম্মজ। স্বভাবজ ও কর্ম্মজ এই উভয়বিধ মাহাত্ম্যই আবার দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ফলাত্মক ও কতকগুলি মানসিক ভাবাত্মক। আমরা ফল-নিষ্ঠ স্থানীয় মাহাত্ম্যের কথাই প্রথমে বলিব।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের আকর্ষণে, নানারূপ নৈসর্গিক বৈচিত্র্যে এবং অন্যান্য কারণে, স্থানের (physical) দৈহিক মাহাত্ম্য ঘটে। কোন স্থানের মৃত্তিকায় বালু কিংবা প্রস্তর-কণিকার অংশ বেসী, কোথাও বা উহা কঙ্কর-বিশিষ্ট, কোন স্থানের মৃত্তিকা রক্ত, শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের, কোন স্থানে চির হিমানীর অবিরাম হিম, কোথাও নিদাঘের নিদারুণ জ্বালা, কোন স্থানে নিত্য বসন্তের সুখদ-বিলাস, কোথাও ষড় ঋতুর পর্য্যায় বিহার। এই হেতু সকল প্রকার উদ্ভিদ, সকল দেশে সমানরূপে জন্মে

না। এক দেশের নিত্য-দৃষ্ট সাধারণ বস্তু অন্য দেশে সৃষ্টির অদ্ভুত বৈচিত্র্য। এই নৈসর্গিক বিভেদ হেতু, সকল স্থানের তরু, লতা, ফুল, ফল, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, এবং মনুষ্যও এক শ্রেণীস্থ বা একবিধ নহে। ভারতের শ্যামল প্রান্তর, হরি-দ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্র, আরবের কঙ্কর-ক্ষেত্রে বা আফ্রিকার সাহারায় অসম্ভব। ভারতের আম কিছুতেই বিলাতে উৎপন্ন হয় না; কাবুলের পার্ব্বত্য মেওয়া শত যত্নেও বাঙ্গালার বিলে ফলে না; আয়র্লণ্ডের আলু আমেরিকার মাটিতে অঙ্কুরিত হইতে চাহে না; নীলাম্বু-বেষ্টিত সিংহলের নারিকেল হিমাদ্রি প্রদেশে জন্মে না; ভারতের শ্যামা ইউরোপের কুঞ্জে গায় না; ইউরোপের ভরত-পক্ষী ভারতের গগনে উড়ে না; আমেরিকার সর্প, ভারতের কাল নাগিনী, আরবের উষ্ট্র, বোগদাদের গরু, আফ্রিকার হস্তী, ও সিংহ, বাঙ্গালার রাজব্যাঘ্র (Royal tiger) অন্যত্র জন্মে না। ভারতের মানুষ ও বিলাতের মানুষ একই মানুষ বটে, তথাপি উভয়ে কত পার্থক্য! এই সমস্তই নৈসর্গিক ফলাত্মক স্থানীয় মাহাত্ম্যের অবশ্যম্ভাবি বৈচিত্র্য।

এই নৈসর্গিক স্থানীয় মাহাত্ম্য, মানবজাতির আদিম সভ্যতা-বিকাশ-বিষয়ে কিরূপ অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,--- ইহা মানবীয় উন্নতির স্তর-বিন্যাসে চিরদিনই কিরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাত্ত্বিকদিগের বিশেষরূপ ভাবিবার ও লক্ষ্য করিবার কথা। স্থান-মাহাত্ম্য কিরূপে, এই সসাগরা ধর-ণীর এক বিশাল পরিবারভুক্ত কোটি কোটি মানবকে, উহার

সুদূর-সূত্রিত বাহ্য প্রাকৃতিক শক্তির ক্রম-তরঙ্গে, মানব-প্রকৃতির উপর কার্য্য করিয়া, অসংখ্য বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অল্পাধিক পরিমাণে, তাহাদিগের ভাব ও ভাষা, আচার, বিচার ও আহার, বিহারে বিচিত্র পার্থক্য জন্মাইয়া, বিভিন্ন জাতীয় স্বভাব-গঠনে সহায়তা করিয়াছে, তাহার তত্ব নির্ণয় ও অনুসন্ধান, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের একটি জ্ঞান-পিপাসা-জনিত সতত-সুখ-কৌতূহলের বিষয়। পাঠক, দৃষ্টান্তস্থলে, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি, যে সকল পুণ্য-ভূমি প্রথমতঃ সভ্যতার তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, মানচিত্রে উহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থান নিরীক্ষণ কর ; দেখিবে, স্থানীয় মাহাত্ম্য কেমন করিয়া জাতিবিশেষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কিরূপ অনন্য-সাধারণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোথাও নীল নদের পললবাহী প্রবাহ, বর্ণ-শূন্য নির্ম্মেঘ বনার সাময়িক প্লাবনে দুকূল প্লাবিত করিয়া, বামভাগে সাহারার প্রতপ্ত বালুকাবর্ষি শুষ্ক নিশ্বাসে দগ্ধীভূত ও কঙ্করাকীর্ণ ভূমির অঙ্গে উর্ব্বরতার মাধুরী ফলাইয়া, আর ডানদিকে, লোহিত সাগরের তরঙ্গদর্শী পর্ব্বতমালার ক্রম উন্নত পাষাণ-দেহে প্রকৃতির চিরস্নিগ্ধ-শ্যামল-শোভা ঢালিয়া দিয়া, বহিয়া যাইতেছে। নদের বদন-সান্নিধ্যে উর্ব্বরতম ব-দ্বীপ। ব-দ্বীপের শ্রুতিমূলে ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গ-গর্জ্জন। সমগ্র ভূমি সমতল শস্যক্ষেত্রে ও মনোহর উদ্যানে পরিপূর্ণ। বৈদেশিক বাণিজ্য-পোতের জন্য চারিদিকে প্রসর জলপথ। কোথাও

একদিকে উন্নত পর্ব্বতমালা, আর একদিকে নীলাম্বুর গভীর বেষ্টনী। জীবিকার জন্য মৎস্যপূর্ণ সমুদ্র। সমুদ্রে বাহির হইবার নিমিত্ত প্রকৃতি-প্রদত্ত অশেষ নেপথ্য-প্ররোচনা। ভিন্ন দেশের সহিত জলপথে বাণিজ্য-সম্বন্ধে, পরিচিত হওয়ায় যেমন সুবিধা, বিদেশের গ্রাস হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে, আত্ম-গোপন বা লুকাইয়া থাকার পক্ষেও আবার তেমনই অসংখ্য স্বাভাবিক উপায়। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ অন্তরীপের সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একই তরুর বিভিন্ন ভাবাপন্ন বহু পুষ্পের একীভূত গুচ্ছের ন্যায় সাগর বক্ষে বিরাজমান। উহার অধিবাসীরা স্বভাব কর্ত্তৃকই জলপথে বহির্গমনে আদিষ্ট এবং স্বাভাবিক স্থানীয় বিন্যাসই যেন স্বদেশী এবং বিদেশীকে সাগর-তরঙ্গ-সংক্ষুভিত এই ভূমিপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টান্বিত। চারিদিকে সাগ-রের অনন্ত বিস্তার নিত্য দর্শন, ঘন-গভীর গর্জ্জন-ধ্বনি নিত্য শ্রবণ, এবং সাগর-তরঙ্গের আস্ফালনের সহিত মল্ল-ক্রীড়ায় নিত্য জীবন যাপন; অধিবাসিবর্গ এই অবস্থায় নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়াই, উহা বীরত্ব ও পুরুষকারের চির-সহচারিণী স্বাধীনতার প্রিয় নিকেতন। কোথাও স্বর্ণ-প্রসূবীর-ভূমি প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ রহিয়া, একই দেহের কোন স্থানে হিম-মণ্ডলের দুঃসহ হিমানী, কোনস্থানে বিষুব-মণ্ডলের অসহ্য জ্বালা, কোন স্থানে সম-মণ্ডলের নাতিশীতোষ্ণ মাধুরী ও কোন স্থানে ষড় ঋতুর পর্য্যায়-বিলাস দেখাইতেছে; সুতরাং উহার

কোন স্থানে শস্য-শ্যামল অনন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর, কোনস্থানে বিবিধ ফল ও অনন্ত-পুষ্প-মণ্ডিত মনোহর উদ্যান-শোভা, কোন স্থানে সাল, সেগুণ ও শিশু প্রভৃতি বৃক্ষাকীর্ণ দুর্ল্লভ আরণ্য সম্পদ্ এবং কোন স্থানে স্বর্ণ, হীরক ও কহিনুরাদি জগদ্দুর্ল্লভ অতুলনীয় খনিজ-গৌরব, অনন্ত জলপথ ও স্থলবর্ত্মে বিদেশীয়-দিগের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; এবং ভাষা, ভাব, সভ্যতা এবং স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন উপকরণ একত্র করিয়া এক বিচিত্র নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া লইতেছে। পাঠক, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস্ ও ভারতবর্ষের এই প্রাকৃতিক অবস্থা, এবং তজ্জনিত ফলগুলি এই সমস্ত কার্য্য-কারণের সহিত মিলাইয়া একবার দেখিবার মত দেখিয়া লও, তাহা হইলেই বুঝিতে পাইবে, এই শ্রেণীর স্থানীয় মাহাত্ম্যের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কতদূর। স্থান-মাহাত্ম্য প্রকৃতই একটা কথার কথা বা উপহাসের সামগ্রী নহে। স্থানীয় মাহাত্ম্য বস্তুতই মানবীয় জীবনের-স্তর-সংস্থান বিষয়ে প্রধান সহায় ও সাধন।

স্থানের এই নৈসর্গিক ফলাত্মক মাহাত্ম্য কি, কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। প্রকৃতি আপনি উহা জীবমাত্রেরই চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু স্থানের নৈসর্গিক হইলেও, ভাবাত্মক বা ভাবোদ্দীপক মাহাত্ম্য সকলের উপভোগ্য বা অধিগম্য নহে। ইতর প্রাণীর নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। পশু-ভাবাপন্ন অবিকশিত মানব-হৃদয়ের কাছেও সে মাহাত্ম্য মাহাত্ম্য নহে। এইক্ষণ নৈসর্গিক ভাবাত্মক

মাহাত্ম্যের কথাই বলিব। এই ভাবাত্মক মাহাত্ম্যই যে মানবীয় উন্নতির প্রবলতর প্রণোদনা বা উত্তেজক কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাঠক, তুমি-যখন বালুকাময় বেলাভূমি হইতে নক্ষত্র-খচিত-নভঃ-নীলিমা-চুম্বি সমুদ্রের ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত-জ্যোতিশ্চূর্ণ-বিলসিত অনন্ত বিস্তার নিরীক্ষণ কর, শ্বেত-ফেণ-কিরীটী নীলোর্ম্মির উত্থান ও পতন দেখ, ও তৎসঙ্গে ভীম গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাও, ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থিত অনন্ত নীলিমাদ্বয়ের অপূর্ব্ব দিগন্ত-সম্মিলন এবং একের হৃদয়ে যেন অন্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লও, তখন তোমার শোণিত-বিহারি প্রাণঘাতি বিষ-বীজাণুর ন্যায়, চিত্তস্থিত, ক্রূর-সর্প-প্রতিম নীচ খলতা ও ঘৃণ্যস্বার্থপরতা, জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং পাশব জিঘাংসা ইত্যাদি ক্ষণকালের তরে; কখনও মৃতবৎ ঢলিয়া পড়ে না কি? --এবং বিশ্ব, সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অংশ স্বরূপ এই উদার-দর্শন প্রেম-বৈরাগ্য-রস-সঞ্চারি মহাদৃশ্য ক্ষণকালের তরেও কি স্রষ্টার ষড়ৈশ্বর্য্যের ক্ষণিক ছায়া হৃদয়ে একটুকু প্রতিফলিত করিয়া দেয় না? আবার সমুদ্রের গভীরতার সহিত উচ্চতায় সমকক্ষ, ঐ যে অভ্রভেদি অচল ও অটল পর্ব্বত স্থানে স্থানে অমল-ধবল-চির-তুষার-কান্তি উচ্চ শৃঙ্গে প্রাতঃ-সৌরকররাশির হিরণ্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় কত যুগ হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—পাষাণ হইয়াও, স্নেহধারা সদৃশ শত শত উপল-বাহিনীর মাতৃক্রোড়-প্রতিম শৈশব-লীলা-নিকেতন, নানারূপ জীবজন্তু-সঙ্কুল বহুবিধ

বিচিত্র-শ্যামল-পাদপ-লতা-গুল্মে-আচ্ছন্ন, নিত্য-নব-বৈচিত্র্যময় নিসর্গ-শোভার লীলাস্থলরূপে, উহা যখনই তোমার নয়ন-সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়, কিংবা যখনই তুমি উহার শ্যামল উপত্যকায় দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে উহার অফুরন্ত অমলিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আলেখ্যবৎ নিরীক্ষণ কর, তখনই কি তোমার মন, মনুষ্যের অসার গর্ব্ব এবং তুচ্ছ ক্ষতিলাভের দায়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জনরূপ ভীষণ সঙ্কল্পের কথা চিন্তা করিয়া, বিষাদে ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হয় না?—এবং অন্য দিকে, হৃদয়ের ও ক্ষণিক আত্ম-জ্ঞানের প্রসরতায় ভাবাত্মক উচ্চতা লাভ করিয়া, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ, তাঁহার উদ্দেশে দীনতার আকস্মিক আবেশে, দৈন্যের কাতরভাবে লুঠাইয়া পড়িতে চাহে না? যেখানে স্বচ্ছ-সলিলা কল-নাদিনী বেগবতী উর্ম্মিমালিনী তরঙ্গিণী লক্ষ উর্ম্মিযোগে শ্যামল পুলিনের চরণ-চুম্বন করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় কখন সূর্য্য-কিরণের স্বর্ণাভা ফলাইয়া, কখন চাঁদের কিরণে জ্যোৎস্নার রজত-টিপ পরাইয়া, সুনীল জলে নিজকে অতনু করিতে আকুলপ্রাণে অকূলের উদ্দেশ্যে কল কল রবে বেগে ধাবিত হইতেছে, তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া একবার তাহার প্রাণের আকুল নীরব ভাষা শ্রবণ কর, দেখিবে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে ইহা শ্রুত হইবার নহে। এই দৃশ্য দেখিলে এবং ইহার ঐ নীরব ভাষা ভাবুকের প্রাণে শ্রবণ করিলে, প্রকৃতই ইহা মন ও প্রাণ-শোষণকারিণী, চিত্তস্থিত সত্ত গরল খণ্ডের ন্যায়, অরুন্তুদ অসহ্য দুঃখ-জ্বালার উপরেও যেন ক্ষত স্থানে স্নিগ্ধ

প্রলেপবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। দেখিবে, উহার নির্ম্মল সলিল, ঐকান্তিক চিত্তের এক সুখ-সমাকুল উচ্ছল প্রবাহ,—উহার কল কল শব্দ যেন তোমার চিত্তকে নির্ম্মলভাবে, একাগ্রতার দৃঢ় নির্দ্দেশ ও আকুলতার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে সেই অবুধ্য নীরব ভাষার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় শক্তির অনন্ত-নিয়ম-সূত্রিত মঙ্গল্য-তানের সহিত একত্র গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যাঁহাদের এই সকল মহান্ ভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে এ পর্য্যন্ত সুবিধা ঘটে নাই, কিংবা প্রত্যক্ষ করিলেও, যাহা এখন সুখ-স্মৃতিতে মাত্র পরিণত, তাঁহারাও যখন অমর কবিদের চিত্র-তুলিকায় অঙ্কিত এই সকল দৃশ্য আলেখ্যবৎ নিরীক্ষণ করেন,—যখন কল্পনার বলে চিত্র-তুলিকার গুণে, মানস-চক্ষে উহার জীবন্ত-আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহাদের মন এই ধূলিময় সংসারের কত ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করে, এবং উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলি কতদূর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা যাঁহারা নিজের প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বলাই বাহুল্য এবং যাঁহারা তাহা এ পর্য্যন্ত অনুভব করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই শ্রেণীর ভাবাত্মক বা ভাবোদ্দীপক স্থান-মাহাত্ম্য কাব্যের সম্পদ্। কবি-হৃদয়ের অথবা ক্ষণিক কবি-ভাবাপন্ন-মানব প্রাণেরই বিশেষরূপে ভোগ্য। কবির চক্ষু ইহা দেখিতে পায়, কবির হৃদয়ই ইহা বিশদভাবে অনুভব করে। দৃষ্টান্তচ্ছলে আমি, কোন বৈদেশিক কবির আশ্রয় না লইয়া, ভারতের পৃথ্বী-বিখ্যাত

'অমিয় মধুরা'—'সরল সুখাক্ষরা' রচনায় সিদ্ধহস্ত 'উজ্জয়িনীর মুকুট-কবি' কালিদাসের নাম উল্লেখ করিতেছি। তুমি যখন তাঁহার রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

কিংবা কাব্য-জগতের অমূল্য সম্পদ্ কুমারসম্ভবে পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ অনন্ত-রত্নের খনি অদ্রি হিমালয়ের বর্ণনা পাঠ কর, তখন তোমার মন বিমল আনন্দরসে আপ্লুত হয় এবং নয়ন-কোণে আপনি কেমন এক উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠে! কিংবা কালিদাসেরই প্রদর্শিত পথে দুষ্মন্ত রাজার রথের অনুসরণে যদি মুনির তপোবনে প্রবেশ কর, তাহা হইলে, তুমি সংসার-অরণ্যের ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা অন্য যে কোন প্রকারের হিংস্র প্রকৃতিক ভয়াবহ জীবই হও না কেন, তপোবনের শান্ত-রসাস্পদ মধুর স্থান-মাহাত্ম্যে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িবে যে, কণ্ব-শিষ্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া তুমিও 'মা বধ মা বধ' রবে তোমার নিত্য-ভোজ্য ভীত মৃগকে আপনা হইতেই আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে অগ্রসর হইবে।

কবি-শ্রেষ্ঠ ভবভূতিও তাঁহার উত্তরচরিত নাটকে স্থান-মাহাত্ম্য-প্রদর্শনে অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উত্তর-চরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্র দর্শন উপলক্ষে রাম, লক্ষণ ও সীতাকে

কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে দূর অতীতের সুদূর স্থানসমূহে কল্পনা-বলে টানিয়া লইয়া, কিরূপ মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি উত্তরচরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। বহু যুগান্তে দণ্ডকারণ্য-দর্শনে সীতা-বিরহ-ক্লিষ্ট রামচন্দ্রের ভবভূতি-বর্ণিত সেই আত্ম-বিস্মৃতি স্থান-মাহাত্ম্যেরই অন্যতর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের, যে কোন যুগের যে সকল জগৎ-পূজ্য মহাকবি এখন পর্য্যন্ত মানব-মনোমন্দিরে ঐহিক অমরত্ব লাভ করিয়া প্রীতি ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে পূজিত হইতেছেন; এবং যে পর্য্যন্ত মানুষের মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ না পাইবে, সে পর্য্যন্ত যাঁহাদের স্মৃতি লোপের কোন সম্ভাবনা নাই; তাঁহারা সকলেই কালের মহিমা প্রদর্শনে ও স্থান-মাহাত্ম্যের প্রভাব কীর্ত্তনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহারা কখন দৃশ্যমান স্থানীয় মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বর্ণমালায় অথবা বাক্যের গাঁথনীতে তাহার আলেখ্য তুলিয়াছেন; কখন বা কল্পিত স্থানের অঙ্গে কল্পিত মাহাত্ম্য ফলাইয়া মানবের মন প্রাণ মুগ্ধ করিয়াছেন। শুধু স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া কথা নহে; তাঁহারা যদি মানব-চরিত্র-চিত্রণে মানবজাতির উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে এইরূপ উদার এবং মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, এই ধূলিময় সংসার হইতে শতহস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইতে সমর্থ না হইতেন; এবং পক্ষান্তরে নটী অথবা পণ্যাঙ্গনার প্রাণ-হীন,—ভাবহীন, উদার ও মহানের বিপরীত ভাব-পূর্ণ দেহ-যষ্টির বাহ্য স্বর্ণালঙ্কার ও

পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে বা চাক্‌চক্যের রুচি-দুষ্ট ও চিত্ত-মালিন্য-জনক অনুকরণে, বর্ত্তমান বহু বঙ্গীয় কবিদিগের ন্যায়, কাব্য সাজাইতে প্রয়াসপর হইয়া স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাবে প্রস্ফুটিত চরিত্র-মাহাত্ম্যের দেব-প্রভাব প্রকটনে বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের কাব্য, কবিত্ব ও নাম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কাল-সাগরে চিরকালের তরে বিলীন হইয়া যাইত।

কবির বর্ণন-তুলিকায় যেমন স্থান-মাহাত্ম্য ও কালের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, চিত্রকরের বর্ণ-তুলিকায়ও উহার তেমনি মাহাত্ম্য ফলিত হইয়া থাকে। উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন-অঙ্কে চিত্রকরের স্থান-মাহাত্ম্য-চিত্রণে যে অসাধারণ নৈপুণ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহা শুধুই কবির কল্পনা নহে। পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা চিত্র-কৌশলের যে ভুরি ভুরি নিদর্শন রাখিয়া যাইতেছেন, একবার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহাকে কবি-কল্পনা বলা যাইতে পারে না। মাইকেল এঞ্জিলো, রাফেল, গুইডো প্রভৃতি অমর চিত্রকরের হস্তে যেমন ফুটিয়াছে মানবীয় মনোভাবের প্রতিকৃতি, তেমনই ফলিয়াছে স্থানীয় দৃশ্যের চারু চিত্র।

এইক্ষণ স্থানীয় কর্ম্মজ মাহাত্ম্যের কথা বলিব। কর্ম্মজ মাহাত্ম্য ও স্বভাবজ স্থানীয় মাহাত্ম্যের ন্যায় ফলাত্মক ও ভাবাত্মক। মানুষ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে মরুর কঙ্করে ভোগবতীর শীতল প্রবাহ বহাইয়াছে, শ্মশানের চিতা-ভস্মে স্ফুরন্ত জীবনের আনন্দ-কোলাহল ফলাইয়াছে, এবং নরকের ন্যক্কারজনক ক্লেদে

অমরার অমল-প্রভা ফুটাইয়াছে। স্থানবিশেষের মানবকৃত এই সকল কর্ম্মজ মাহাত্ম্যের সহিত বাহ্যিক ফল-নিষ্ঠতা ও আন্তরিক ভাবুকতা উভয়ই সমানরূপে সম্পৃক্ত।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য-নিবাসে তুমি তোমার রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া প্রবেশ কর, দেখিবে অচিরেই তোমার বিকল শারীর যন্ত্র সকল প্রকৃতিস্থ হইতে আরম্ভ করিবে। একদিকে যেমন শরীর সুস্থ হইতে থাকিবে, অন্যদিকে ঐ স্থানের বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র সমাবেশ দর্শনে মানবীয় প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া, তোমার মনে বিস্ময়-বিমিশ্র বিমল আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠিবে। এ উভয়ই স্থানীয় মাহাত্ম্যের অপরিহার্য্য ফল।

একদিকে প্রকৃতির অপার লীলা, অন্যদিকে সেই প্রকৃতির অঙ্গে প্রকৃতিরই প্রিয়তম সন্তান মানুষের অতুল কীর্ত্তি। স্থান-মাহাত্ম্যে মানুষের কীর্ত্তিও অবহেলার সামগ্রী নহে। তুমি যখন মনুষ্য-কীর্ত্তির জয়-স্তম্ভস্বরূপ সৌধমালা-বেষ্টিত বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় পরিশোভিত, বহু মূল্যবান্ নানারূপ আশ্চর্য্য, সুন্দর ও ব্যবহার্য্য জিনিসে সুসজ্জিত বিপণি-শ্রেণী-পূর্ণ অমরা-বতীসদৃশ সভ্য ও স্বাধীন জাতির রাজধানী দেখ, অথবা কল্পনা-নেত্রে উহার বিষয় চিন্তা কর, নানারূপ যান ইত্যাদিতে মুখরিত প্রসর রাজপথে জল-স্রোতের ন্যায়, নিরন্তর জন-স্রোতের চির-বহমান প্রবাহ এবং চতুর্দ্দিকে বিপুল কর্ম্মের অবিরাম অশ্রান্ত আয়োজন দেখ,—উচ্চ বিচারালয়ে ন্যায়ের

মর্য্যাদা রক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা এবং দেশের অধিকাংশ গণ্য, মান্য, বিজ্ঞ বড় লোকের একত্র সমাবেশ দর্শন কর, এবং সর্ব্বোপরি সাম্যের প্রভাব প্রাণে বিলক্ষণরূপে অনুভব করিয়া লও, পরাধীন হইলেও, তখন জন-স্বাধীনতার সুখ-সমীরে প্রাণে একটু সুখ ও অপূর্ব্ব সান্ত্বনার ভাব অনুভব কর না কি? ইহার সহিত আবার যখন, কোন অধঃপতিত দেশের নারকীয় ক্লেদপূর্ণ ক্ষুদ্র সহরের অর্থ, প্রভুত্ব কিংবা স্তুতি বা শুশ্রূষা লাভে ব্যগ্র ধর্ম্মাবতার নামধারী দানবদিগের বিষয় চিন্তা কর, কতকগুলি তাদৃশ দেশজ চির-পর-মুখ-প্রেক্ষী কামধেনু কর্ত্তৃক নিরন্তর তাহাদিগের মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বিত হয় এবং সেই উপায়ে, সুপারিস ও করুণ ক্রন্দনের বিচিত্র অভিনয়ে উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রত্যক্ষ কর, কিংবা যখন পর-পদ-লেহনে লম্বিত-জিহ্ব, সর্ষপ-পেষিত তৈলের ন্যায় নিরীহ গরীব-প্রজা-পেষণে উৎপন্ন অর্থরূপ শোণিতে পুষ্ট, জঘন্য জীব কতকগুলিকে টাইটেলের ঝুলি ক্রয় করিবার নিমিত্ত কড়ায় ক্রান্তিতে, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি ঋণ করিয়াও, বাজী পোড়ানে, কিংবা ডিনারের ব্যয়ে সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিতে দেখ, অথবা দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী কতকগুলি সারমেয় সদৃশ 'হাম্ বরার' অত্যাচারে সমস্ত বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইতে দর্শন কর, তখন প্রাণ আপনি কি ভয়ে, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পড়ে না? সুসভ্য স্বাধীনজাতির রাজধানীর কি মাহাত্ম্য, তাহা যাঁহারা তথায় পাদক্ষেপ

করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা লণ্ডন, ওয়াশিংটন কিংবা পারিস প্রভৃতি কএকটি তীর্থস্থান তুল্য রাজধানীর নাম উল্লেখ করিতে পারি। যে লণ্ডন-নগরী বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টস্বরূপ মহাসভার প্রসূতি বলিয়া সমস্ত মানবজগতে স্বাধীনতার ক্রীড়া-ভূমিরূপে পরিচিত,—যে লণ্ডন, আমেরিকারও বহু পূর্ব্বে, দাসত্ব-প্রথার মূলদেশে কুঠারের আঘাত করিয়া, পৃথিবীর ইতিহাসে পূজার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, এবং আমেরিকার দাস-বিপ্লবের সময়ে জন্‌ ব্রাইট্‌ প্রভৃতি বাগ্মিকুল-শিরোমণিদিগের জিহ্বায় জ্বলন্ত-বহ্নি বৃষ্টি করিয়া, সুখ-সুপ্ত মানবজাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দাসত্ব-নিপীড়িত ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য কেনেডার ব্রিটিশ অধিকারে আশ্রয়-স্থান উন্মোচন করিয়া, মনুষ্যকে ভক্তির অশ্রুজলে আপ্লুত করিয়াছে, সেই লণ্ডনের কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, —"পৃথিবীর যেখানে যে দাস নামে অভিহিত থাক, লণ্ডনে চলিয়া আইস ; কেন না, লণ্ডনের পবিত্র ভূমিতে পাদ-ক্ষেপ মাত্রই দাস স্বাধীন হয়—দাসের পায়ের লৌহ-শৃঙ্খল, যেন মন্ত্রবলে, শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়।"

লণ্ডনের মাহাত্ম্য অধিক লিখা নিস্প্রয়োজন। আমেরিক স্বাধীনতার স্রষ্টা অথবা পিতা বলিয়া জগৎ সংসারে পূজিত জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নামের অনুকরণে আমেরিকায় যে যুক্ত-রাজ্যের রাজধানীর নামকরণ হইয়াছে, সেই ওয়াশিংটন নগর স্বাধীন-তার রঙ্গভূমি বলিয়া চিরদিনই জগতে আদৃত। ওয়াশিংটনে

পদার্পণ করিলেই,উহার ইতিহাস, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ওয়াশিংটনের কীর্ত্তি-কথার প্রতি সাদরে ও সগৌরবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া,আগন্তুক, ভারতের বিপন্ন আর্য্য-সন্তানই হউক, আর আফ্রিকার দাসত্ব-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত বন্য বর্ব্বরই হউক, তাহারই প্রাণটিকে স্বাধীনতার অননুভূত-পূর্ব্ব পবিত্র ভাবাবেশে আকুল করিয়া তুলিবে।

ফরাশির রাজধানী পারিসে যাও, স্বাধীনতার নামে বিপথগামিনী জনসাধারণী শক্তি যেখানে রক্ত-গঙ্গার ভয়াবহ প্রবাহ বহাইয়াছিল, যে রক্ত-বন্যায় স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন ফরাশিভূমি প্লাবিত হইয়া, রাজ-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত ও উহাকে ক্রমে বৃহৎ পাদপরূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে ;—যাহার ফলের আস্বাদ এখন সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চ হইবে। অন্যদিকে কর্সিকার যে অজ্ঞাত-কুল-শীল যুবক পরিণামে ভূ-ভার ধারণ-ক্ষম নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন এবং প্রবল-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়, ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খল ফরাশি সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে উপবিষ্ট হইয়া, যিনি একমাত্র সাগর-পরিখা-বেষ্টিত দৈবানুগৃহীত শ্বেতদ্বীপ ব্যতীত, সমগ্র ইউরোপকে আপনার লৌহ-মুষ্টির তলে আনিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি তোমার ধমনীতে তাড়িত সঞ্চার করিবে।

আমরা স্থান-মাহাত্ম্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এইক্ষণ কাল-মহিমা-বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। স্থান-মাহাত্ম্য

অস্বীকার করিতে প্রথমে যত দ্বিধা উপস্থিত হয়, কাল-মহিমা অস্বীকার করিতে প্রথমে অনেকের তাহা নাও হইতে পারে। কারণ, স্থান-মাহাত্ম্য অপেক্ষা কাল-মহিমার অনুভূতি একটু সূক্ষ্মতর—বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তর ইন্দ্রিয়েরই অধিকতর উপভোগ্য। মনে হইতে পারে, এই অনাদি অনন্ত কালের সকল কালই ত কাল; উহা যেমনই অনাদি অনন্ত, তেমনই এক ভাবাপন্ন ও বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্ব-বৰ্জ্জিত। কিন্তু অদৃষ্ট নামক একটা অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞাত বস্তুকে যেমন আত্ম-কৃত-কর্ম্ম ও তাহার ফলের জন্য অনেক সময় দায়ী মনে করা হয়, তেমন আত্ম-কৃত-কর্ম্ম ও তাহার ফলকেও অজ্ঞেয় অদৃষ্টের প্রসূতি বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। এই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন-রহস্য—এই জন্য এবং জনিতের মধ্যে, পর্য্যায়ক্রমে একের স্থানে অন্যের আরোহণ ও অবরোহণ-নীতি ইত্যাদি অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নির্ব্বিকার ও বিরাম-শূন্যভাবে চির-প্রবহমান রহিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কালকেও আমাদের মানবীয় ভাবাবিষ্ট চক্ষে একটু অভিভূত করিয়া তোলে এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও মলিন ইত্যাদি বর্ণ-বৈচিত্র্যে চিত্রিত করিয়া দেয় বলিয়া বোধ হয়।

মানুষী প্রতিভার জ্বলন্ত বিগ্রহস্বরূপ, বিশ্ব-বিজয়িনী, পাষাণ-দ্রবিণী উচ্চতর মানসিক সম্পদে বিভূষিত অলোক-সাধারণ মহাপুরুষগণ, জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে অমানুষিকতা দেখাইলেও, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি-বিষয়ে সাধারণত্ব রক্ষা

করিয়া, কালের ক্রোড়ে সময়ে বা অসময়ে অন্তিম-শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। জগতের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষেরা যে কালের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, মনুষ্য-সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট আমরাও খাইয়া, শুইয়া, দর্পণে মুখ মাত্র দেখিয়া এবং বিলাসের গদিতে অঙ্গ হেলাইয়া, সেইখানেই ঢলিয়া পড়িতেছি। এই অসীম কাল-সমুদ্রের ঊর্ম্মি-পৃষ্ঠে আমরা সকলেই ভাসমান হইয়া, কখনও ঊর্দ্ধে উঠিয়া সম্পদের মদিরায় আত্ম-বিস্মৃতভাবে, অন্যের ক্রন্দনে বধির হইতেছি ও পদে পদে শক্তির অপব্যবহার করিতেছি,—কখনও গতিপথকেই গম্যস্থান বুঝিয়া, আপনাকে সিদ্ধ ও অভ্রান্ত মহাপুরুষ ভ্রমে গর্ব্বের ডঙ্কায় দিগ্বলয় বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছি; আবার কখনও নিম্নে পড়িয়া, সেই ঊর্ম্মির নিদারুণ আঘাতেই লবণাক্ত সলিলে দুঃখের তরঙ্গে হাবু-ডাবু খাইয়া, অনুতাপ ভোগ কিংবা অদৃষ্ট-নিন্দা করিয়া, সকলের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতেছি; কখনও তরঙ্গের পর তরঙ্গ অতিক্রম করিতে করিতে, ঊর্দ্ধস্থিত সুনীল ব্যোম-সমুদ্রের তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, আর হৃদয়, উহার অননুভূত উচ্চতাহেতু, নৈরাশ্য-মিশ্রিত এক বিচিত্র প্রেমাকুলতায় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; আবার তখনই কুম্ভীর, নক্র, হাঙ্গর ইত্যাদি রক্ত-পিপাসু জন্তুদের আক্রমণে সন্ত্রাসিত হইয়া, মনকে পুনরায় অবনমিত করিয়া, সেই তরঙ্গ-তাড়নে—সেই প্রাবরণ-পরিধির মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তদুপযুক্ত উপায় অবধারণে মনকে নিয়োজিত করিতেছি।

কখনও বা চন্দ্রালোকে অপ্সরাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত মন-উন্মাদন সুমিষ্ট সঙ্গীত সুদূর হইতে বাতাসে ভাসিয়া যেন কর্ণে পশিতেছে, এবং তাহাতে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব মোহাবেশ সঞ্চারিত হইয়া, জীবনের কর্ত্তব্য নিরূপণে দ্বিধা জন্মাইতেছে। আবার প্রাতঃ-সূর্য্য-কিরণ স্পর্শ মাত্রই সেই স্বপ্ন-জড়িমা যেন পলকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং প্রস্ফুট আলোকে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য-পথ, ক্ষতি-লাভ, শত্রুতা-বন্ধুতা, সাংসারিক উন্নতি-অবনতি বিষয়ের অনন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়া, হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তুলিতেছে; এবং মায়ার কোমল বন্ধন যেন যুক্তির প্রত্যক্ষ ছুরিকাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

কাল-সমুদ্রে যাহার তরী ভাসিয়াছে, তাহারই গতি ও পরিণতি ন্যূনাধিক মাত্রায় এইরূপ। কিন্তু, তথাপি এই গতি ও পরিণতিতে সময় ও অবস্থাভেদে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। বল দেখি কয় জনে, ঐ সকল মহাপুরুষদিগের ন্যায়, ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবন লইয়া, আমাদেরই মত একই সঙ্গে অসীম কাল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, উহার কীর্ত্তি-রূপিণী, যশঃ-স্বরূপিণী, ঐহিক অমরত্ব-বিধায়িনী বারুণীদেবীর প্রবাল-মণি-মুক্তা-খচিত—অরুন্ধতি নক্ষত্রের অমল আভার ন্যায়, মন-প্রাণ-স্নিগ্ধ পবিত্র শ্বেত-জ্যোতি-রূপে মানব-মন্দিরের অতুল আসনে স্থান পাইয়াছেন? আবার অন্যদিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখ, কাল-সমুদ্রে অনন্ত কোটি প্রাণী অফুরন্তভাবে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে; প্রাণীর উদয় ও লয়-ব্যাপারে মুহূর্ত্তের বিরাম নাই। কিন্তু যাঁহাদের স্মৃতি অজড়,

অমর হইয়া, প্রীতির ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা নিত্য অর্চ্চিত হইতেছে, তাঁহাদের শূন্য আসন ঠিক তেমনইভাবে প্রায়শঃই একবার বই দু'বার পূর্ণ হইতে দেখা যায় নাই। কাল-মহিমা ব্যতীত আমরা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এই অবস্থার অন্য কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি?

কাল-মহিমা যেমন জগতের নানা অংশে নানা দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য দেখায়, জগতের বৈচিত্র্যও তেমনই উজ্জ্বল হউক, আর মলিন হউক, উহার উপরে তাহার নিজের একটা আভা ফলাইয়া দেয়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে, বোধ হয়. কথাটা একটু সহজ হইতে পারে। আমরা অল্প কএকটি মাত্র নামের উল্লেখ করিতেছি। বাল্মীকি, হোমর, কিংবা ব্যাস প্রভৃতি জগদ্গুরু কবি, সেক্ষপিয়র, কালিদাস প্রভৃতি জগৎ-পূজনীয় কবি, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি প্রেম, ভক্তি ও প্রতিভার অবতার, বোনাপার্টি কিংবা ওয়াশিংটন প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্ম-বীর যে যে বিশেষ বিশেষ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার পরে এ পর্য্যন্ত ঐ সকল মহাপুরুষদিগের তুলনায় সমকক্ষ ব্যক্তি একটিও জন্মগ্রহণ করেন নাই কেন?—না, যে যুগ-মাহাত্ম্যরূপ অজ্ঞাত শক্তির অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজন-আদেশে, জগদারাধ্যা আদি জননী ভগবতীর বিশ্ব-উন্মেষণী দেব-শক্তি প্রকৃতির মহান্ ক্রোড় হইতে, পঞ্চভূতের অনন্যসাধারণ উপাদান আহরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে ফুটাইয়াছিল, সেই অজ্ঞাত শক্তি মহাকাল-সাগরে বিলীন হইয়াছে।

নির্দ্দয় ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ-দম্পতিকে শর-বিদ্ধ হইতে দেখিয়া, যিনি, কমল-কুঞ্জাসনা ঊষাময়ী বাণীর কৃপায় মধুময়ী দেব-ভাষায় প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিয়া, নিজেই নিজের স্বর এবং ভাষার মাধুর্য্যে মোহিত, বিস্মিত এবং আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই আদি কবি বাল্মীকি, যখন পূত-সলিলা ভাগীরথীর তর তর প্রবাহের ন্যায়, মধুর শান্ত-রসাস্পদ সংস্কৃত ভাষায় জগৎ-পূজ্য রামায়ণ রচনা করেন, তখন সূর্য্য সদৃশ তেজঃসম্পন্ন রঘুবংশীয় "নৃপতিষু রামঃ"—নৃপতি-শ্রেষ্ঠ রাম অযোধ্যার রাজ্যাসনে আসীন। যাঁহার চারিত্র-বল, প্রকৃতি-রঞ্জন ও আত্ম-ত্যাগের দুর্নিরীক্ষ্য মহিমা মানব-জাতির কল্পনার বিষয়—গুণাতিরেকই যাঁহার এক-মাত্র দোষ, তিনি যদি ঐ সময় আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে কবি-গুরু বাল্মীকির তমন অলোক-সাধারণ কাব্যের উপাদান সংগৃহীত হইত কি না সন্দেহ। ইউরোপের কাব্য-জনক হেলেনার অন্ধকবি হোমার সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযুজ্য। যে সকল বীরের জন্মস্থান বলিয়া গ্রীস দেশ, বীর-ভূমিরূপে সম্পূজিত, সেই সকল বীরগণের চরিত্র-চিত্রণে হোমারের ইলিয়ড্ জগৎ-প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। একিলিস্, 'এগামেম্নেন্, এজ্যাক্স,, নেষ্টর, ইউলাইসিস্ প্রভৃতি বীরগণ ও জ্ঞানিগণ, হেলেনের ন্যায় জগদ্দুর্ল্লভ রূপসী, লঙ্কাপুরীর ন্যায়, বহু প্রাচীন অখণ্ড-প্রতাপ-সমৃদ্ধশালী ট্রয়, হেক্টর প্রমুখ শত শত অসাধারণ বীরগণ প্রভৃতি উপাদান যদি সেই কালে না থাকিত, তাহা হইলে হেলেনার রূপানলে ভস্মীভূত ট্রয় নগরের কথা, অসংখ্য

বীরের অসময়ে রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশের পরে, শর-শয্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার করুণ-গাথা, জুপিটার, জুনো, মিনার্ভা প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীগণের, মনুষ্যের প্রাণ লইয়া, মনুষ্যের কর্ম্মে যোগ দেওয়ার অলৌকিক কাহিনী, ইউলাইসিসের দৈব-দুর্ব্বিপাকজনিত অনন্ত ঘটনা, আমরা কখন শুনিতে পাইতাম না,—ইলিয়ডের করুণ-মধুর দীপক-ঝঙ্কার মানব-জগতে কখন শ্রুত হইত কি না সন্দেহ। পৃথিবীর অদ্বিতীয় কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যখন তাঁহার অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনা করেন, তখন ভারতের চূড়ামণি ব্যক্তিগণ সকলেই বর্ত্তমান আছেন। দ্বারকায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাতে অসংখ্য যদুবীর। হস্তিনায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতি রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্রবর্গ। বিদ্যোৎসাহী বিক্রমাদিত্যের বিদগ্ধ-বহুলা-পণ্ডিত-সভাতেই উজ্জয়িনীর মুকুট-কবি কালিদাস এবং এলিজাবেথের সময়েই জগৎ-পূজ্য সেক্ষপিয়র ও একদল অনন্য-যুগসাধারণ নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারত-বর্ষকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখনই ব্রহ্মণ্য-বলের সমবেত শক্তি লইয়া, শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার শক্তিতেই বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—এই ধর্ম্ম-সূত্র ভক্তি ও ভগবান-বিহীন নীরস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভারত ছাড়িয়া সুদূর সিংহল, জাপান, ব্রহ্ম এবং চীনে আশ্রয় লইয়া-ছিল। আর ঐ কঠোর অহিংসা-ধর্ম্মই ভারতে দয়ার অমিয়ে দ্রবীভূত হইয়া ও ভক্তিতে নূতন প্রাণ পাইয়া, সেই এক অভিনব

বিচিত্র ভাবে, পুনরুজ্জীবিত সনাতন ধর্ম্মরূপে ভগবানের পাদ-পদ্মে প্রণত হইয়াছিল। নবদ্বীপ বঙ্গের শীর্ষ-স্থানীয় বিদ্বজ্জন-সমাকীর্ণ রহিয়াও এবং অমূল্য সারস্বত-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও, ভক্তির অভাব ও তর্কের প্রভাবে যখন নীরস-কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই সোনার পুতুল, প্রেম-ভক্তির অবতার গৌরাঙ্গ-দেব, নিজে প্রেমাশ্রু-সিক্ত হইয়া, কেবল নবদ্বীপ কেন, সমস্ত বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র ফ্রান্স ও আমেরিকার তৎসাময়িক অনুকূল কাল-মাহাত্ম্য ব্যতীত, বোনা-পার্টি কিংবা ওয়াশিংটনের জন্ম হইত কি না সন্দেহ। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয়, সাগর-পরিখা-বেষ্টিত ইংলণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, কাল-মাহাত্ম্যে পূর্ব্বে ক্রমওয়েল্ ফুটিয়াছে, এখন গ্লাডষ্টোনের ন্যায় লোকের আবির্ভাব হইতেছে। সকলই শক্তি ; কিন্তু সেই শক্তিরই কাল-মাহাত্ম্যে, বাহ্য আকার প্রকার ও অন্তর্নিহিত পরিমাণ ও গুণে কত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ভূবন-বিজয়ী, অমিত-বিক্রম অস্ত্রধারী বীর (Hero) ছিল। এক্ষণ বিশেষণের কোনরূপ অপব্যবহার না করিয়া,—বিজ্ঞান দর্শনের গভীর তত্ত্ব আবিষ্কারে, কবিত্বের অফুরন্ত অমৃত-উৎস স্থাপনে, লেখনীর অনল-বর্ষি ক্ষমতা ও রোমাঞ্চকরী বাগ্মিতায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে (Hero) আখ্যা প্রদান করা হয়।

কাল-মহিমার কর্ম্ম কেবল এই একদিকেই পর্য্যাপ্ত নহে। কাল ষড় ঋতুর পর্য্যায় ও পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। আমরা চিরদিনই ষড় ঋতুর নামভেদ এবং উহাদিগের কর্ম্মে ও আকারে

প্রকারে পার্থক্য দেখিয়া আসিতেছি। কাল, কোন এক শ্রেণীর জীবকে একেবারে লোপ করিয়া, অন্য শ্রেণীর জীব তাহার স্থানে আনিয়া দিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যে সকল জন্তু পৃথিবীতে বিচরণ করিত বলিয়া আমরা প্রমাণ পাই, এখন আমরা আর সেই সকল জীবের চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না। পার্থিব স্তরের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানে আমরা পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে এই শ্রেণীর কাল-মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত কালের আরও অনন্ত কর্ম্ম ও অনন্ত প্রকার লীলা-তরঙ্গের পরিচয় নিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐন্দ্রজালিক যেমন উড্ডীয়মান ধূলি-মুষ্টিকে ধরিয়া লইয়া, মন্ত্র-বলে প্রস্ফুট পুষ্পগুচ্ছে পরিণত করে, কালও তেমনি বিন্দুমাত্র শুক্র-শোণিতের সংযোগে শিশুর কমনীয় তনু গড়াইয়া লয়, এবং মায়ের বুকে চাঁদের হাসি ফুটাইয়া দেয়। কালের অমোঘ আজ্ঞায় শিশু বালক হয়। বালক যৌবন সীমায় পদার্পণ করে। যুবক ক্রমে আধ-শ্যামল, আধ-ধবল, হরি-হররূপে সজ্জিত হইয়া, কপালে ভাবনার রেখা টানিয়া, সংসারের হা'ল ধরিয়া বসে। সেই প্রৌঢ় আবার কাল-প্রেরিত বার্দ্ধক্যের বাতাসে শুক্লকেশ ও পলিতবেশে অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরিয়া, কম্পিত করে অনিচ্ছায় সংসারের হা'ল ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারে ঢলিয়া পড়ে।

সুন্দরী যুবতী পতির উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পদে আপনার বরাঙ্গ সাজাইয়া, মদভরে মাটীতে পাদক্ষেপ করিতে চাহেন

নাই। আপনার সুষমা-রঞ্জিত অরবিন্দ-আননের অফুরন্ত রূপের চমক দিবসে দশবার দর্পণে দর্শন করিয়া, আপনার ভাবে আপনি আত্মহারা রহিয়াছেন। কালের স্পর্শে তাঁহার রূপ ও যৌবন আজি কোথায়? কাল তাঁহার কমল-মুখখানিকে শ্লথ চর্ম্মে আবৃত করিয়া, কুন্দসদৃশ দন্ত-পংক্তি ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, সেই নিতম্ব-চুম্বিত, ফুলেলা বা কেতকী-কুসুম-সুবাসিত কেশরাজি আজি শণের নুড়িতে পরিণত করিয়াছে! এ সমস্তই কালের কারিকরি। কাল টিকির উপরে শামলা চড়ায়; পাগড়ীর মাথায় হ্যাট বসায়; ধুতির কোমরে ইজার ঝুলায়; বিভূতি-ভূষিত নামাবলীর অঙ্গে সার্ট, কোট পরায়; নটবরের বংশী-চুম্বিত শ্যাম অধরে চুরট ধরায়; কালের হুকুমে 'ঘটীরাম' ডেপুটি হয়, ডাকাত ডাক্তার সাজে, মুচি শুচি হইয়া আচার্য্যের আসন অধিকার করে, আচার্য্য বর্ণশর্ম্মা হইয়া, বুজরগির হুজুগে পসার করিতে বহির্গত হয়; কেহ লাঙ্গল ফেলিয়া কলম ধরে; কেহ কলম ফেলিয়া লাঙ্গল লয়; কেহ মসনদ ছাড়িয়া, কালিয়া কোরমার মায়া কাটাইয়া, গাছের তলে শয়ন করে, ও ফল, মূল বা হরিতকী চিবাইয়া ঘৃত-পুষ্ট হৃষ্ট তনু ক্লিষ্ট করিতে অগ্রসর হয়; কেহ ফল মূলের ঝুপরি নদীর জলে ভসাইয়া দিয়া, কারি-কাট্‌লেটের সুবাসে তপোবন আমোদিত করে; চোর সাধু সাজিয়া তিলক কাটিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গেড়ুয়া বসনের শ্রাদ্ধ করে; কেহবা বৈরাগ্য-রোগে আরোগ্য লাভ করিয়া, গৃহিণীর অঞ্চলে আশ্রয় লয়।

কাল নীতিকে অনীতি ও অনীতিকে নীতি করে। নরকের পিশাচকে ধরিয়া আনিয়া ধর্ম্মাবতারের আসনে বসায় এবং দশ জনের চক্রে বিধি-ব্যবস্থায় অদ্ভুত ফাঁদে ফেলাইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মাবতারকেও চোর বানায় ও তাঁহার পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত নির্দ্দোষ কর-চরণে অপরাধের বেড়ি পরাইয়া দেয়। কাল কাহাকেও যক্ষ, কাহাকেও রক্ষ করে, কাহাকেও কামধেনু বানায়; এবং সেই কামধেনুর সহায়ে শুভঙ্করের দ্বারা ঘাস কাটাইয়া 'নদের চাঁদ' বনাইকে সেরেজদারের আসনে বসায়, আবার কখনও চাণক্যের দ্বারা কুশ বাছাইয়া, মোসাহেবকে খাস-করা মন্ত্রীত্বে বরণ করে। কাল আরও কত কি করে, বলিয়া শেষ করা অসাধ্য।

কাল জীবনের স্তর-সংস্থানে অদ্বিতীয় নিয়ামক। মানবীয় স্তরের গঠন যখন যে শ্রেণীর উপাদানে হওয়া উচিত, কাল শুধু সেই শ্রেণীর উপাদান সংযোগে উহার এক একটা সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহে না; কখন কখন, এক এক বিষয়ে এক একটা অলৌকিক প্রতিভার সৃষ্টি করিয়া, উচ্চতর ভাবী স্তরেরও আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমরা স্থান ও কাল-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। কালের এই প্রকৃতি-পর্য্যালোচনে এক্ষণ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে, যখন কোন বৃহত্তর শক্তি দেশ ও কালের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া আবির্ভূত হয়, যখন কোন শক্তি কালের গতি ফিরাইবার নিমিত্ত কাল-স্রোতের প্রতিকূলে, অটল ও অজড় পর্ব্বতের মত

আপন বলে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করে, তাহার অমোঘ আজ্ঞায়, স্বাভাবিক গতিতে সময়ে কালের ভাব-পরিবর্ত্ত ঘটিলেও, তখন তাহাকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা দু'টি মহাপুরুষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছি। যাঁহার পুণ্যময় পবিত্র নামে এখন অর্দ্ধ পৃথিবী উন্মাদিত, কোটি কোটি লোক যাঁহাকে পরিত্রাতা প্রভু বলিয়া, উদ্বেলিত হৃদয়ে ক্রুশ (Cross) ঝুলাইয়া, প্রেমাশ্রুজলে সিক্ত হই-তেছে. যিনি জগতের দুঃখ হরণের নিমিত্ত ক্রুশ-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ও রোমহর্ষণ অসহ্য ক্লেশ ভোগের পর, আসন্ন সময়ে নয়ন-জলে ভাসিয়া ভাসিয়া, উৰ্দ্ধনেত্রে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট, পরের পাপে অনুতপ্ত হইয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমল বিশ্বদ্রবকরি প্রেমের কথা পৃথিবীতে একবার বই দুইবার শ্রুত হয় নাই; হায়, সেই প্রেম ও দয়ার-বিগ্রহ মহাপুরুষকেও কতকগুলি পশু-প্রকৃতি অন্ধ লোকের হাতে ক্রুশ কাষ্ঠে (Cross) প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। ইহা কেন?—না, দ্রবময়ী পুণ্য-পয়স্বিনী সেই পীযূষময়ী অলৌকিক শক্তি তখনকার সেই দেশ ও সেই কালের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া, বিধাতার কি নিগূঢ় কার্য্য-শৃঙ্খলায় ফুটিয়া পড়িয়া-ছিল। তদানীন্তন লোক-সমাজ তখনকার সেই বুদ্ধি ও বিবেক-বলে ইহার অলোক-সাধারণ মহিমা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই।

ইউরোপের জ্ঞান-গুরু সক্রেটিশকেও গ্রীসের কতকগুলি অবোধ পশুর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। যাঁহার

চিন্তা-প্রসূত গভীর-তত্ত্ব-জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ইউরোপের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনকারী এরিষ্টট্‌ল, প্লেটো প্রভৃতি অসামান্য জ্ঞানিগণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ও যাঁহার শিষ্যদের জ্ঞান-গর্ভ বাক্য পাঠ করিয়া, পাশ্চাত্য জগৎ মনোবিজ্ঞানের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে, যাঁহার চিন্তা-সূত্র ধরিয়া ইউরোপের চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার ঐ প্রকারের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা এবং পরিশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্তও যে, তদ্দেশবাসী কতকগুলি নরাধম কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, এই বিচিত্র ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়-কর বোধ হইলেও, উল্লিখিত কারণেই সম্পূর্ণ সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। স্থান ও কালের মহিমাকে অতিক্রম করিয়া যে কোন মহত্তর শক্তি আবির্ভূত হউক না, উহা যে কোনরূপ অলোক-সাধারণ গুণরাজিতে বিভূষিত থাকুক না কেন, উহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও আপন্ন হইতে হইবে। ঈদৃশ শক্তিশালী মহাপুরুষের স্মৃতি পৃথিবীর অসংখ্য স্থান হইতে কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়ের পূজা পাইলেও, জীবিত কালে তাঁহাকে লাঞ্ছনার কশাঘাতে নিশ্চয়ই ক্ষত বিক্ষত হইতে হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঐ সকল মহাপুরুষগণ, কাহারও কোন অনিষ্ট করেন না। তবে জনসাধারণ, এমন কি সহৃদয় ব্যক্তিগণও, তাঁহাদের কোন উপকার না করুক,—বিদ্বেষ বা লাঞ্ছনা করে কেন? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি

যে, মানুষের চরিত্রে দেব-ভাবের সহিত পশু-ভাব মিশ্রিত। মানব-প্রকৃতির স্তরে স্তরে ব্যাঘ্র, মহিষ, সর্প, বা কুক্কুর ইত্যাদির নানারূপ হেয় ও হিংস্র জন্তুর কঙ্কালও লুক্কায়িত থাকে এবং সময় ও সুযোগ পাইলেই সেই কঙ্কাল স্বভাবের অনুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জাগিয়া উঠে। যাহারা সাধনা-বলে জ্ঞান লাভ করিয়া, চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে সম্যক্‌রূপে বশে আনিতে না পারিয়াছে, তাহারা আপনাদের শিক্ষা দীক্ষার পরিমাণে ন্যূনাধিকরূপে ঈদৃশ ভাবাপন্ন। তাহারা কখনও মহিষের প্রবৃত্তিতে জাগরিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা তাড়না করিয়া নিজদের দল হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বভাবের জীবকে বাহির করিয়া দেয়; কখনও ব্যাঘ্র হইয়া তাহার হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলে, কখনও বা সর্পের ন্যায় ক্রূর উপায়ে তাহাকে অলক্ষিতে দংশন করে। এইরূপ অভিনয়ই সংসার-রঙ্গালয়ের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা এবং একমাত্র কালই ঐ সকলের প্রবর্ত্তক ও প্রয়োজক কর্ত্তা।

রাজসূয়-যজ্ঞে ভারত-সম্রাট্‌রূপে সম্পূজিত, রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের জন্য সমস্ত প্রকার ত্যাগ-স্বীকারে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠির সর্ব্বতোভাবেই এক ও অভিন্ন এবং এই গুণেই তিনি পরিণামে সশরীরে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ধর্ম্ম বক-রূপ ধারণ করিয়া, ভ্রাতৃ-শোকার্ত্ত ও বনবাস-ক্লিষ্ট এ হেন যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষার্থ "কাচ বার্ত্তা, কিমাশ্চর্য্যং"—ইত্যাদি কতিপয় প্রশ্ন করেন। "বার্ত্তা

কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—"এই অজ্ঞানতাপূর্ণ মোহময় সংসার একটা বিশাল তৈল-কটাহস্বরূপ। কাল পাচকরূপে এই মহা কটাহে, রাত্রি ও দিবসরূপ ইন্ধনযোগে সূর্য্যরূপ অগ্নি দ্বারা, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বীর পরিঘট্টন সহকারে ভূতগণকে পাক করিতেছে।" ইহাই বার্ত্তা। আমরাও বলি, বস্তুতঃ ইহাই বার্ত্তা। ব্যাসের স্বাক্ষরিত, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রাণ মহাপুরুষের এই উক্তির সারবত্তা ও প্রামাণিকতা কে অস্বীকার করিবে? তাই পুনরপি বলিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই বার্ত্তা। কালের শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, জগতে কাহারও এমন শক্তি সামর্থ্য নাই। কালের মহিমা বস্তুতই অমোঘ, অলঙ্ঘ্য, অনন্ত ও অপরিমেয়। আমরা যে স্থান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অত কথা বলিয়াছি, উহারও নিয়ামক ও প্রয়োজক কর্ত্তা বা স্রষ্টা ঐ কাল। কাল আধার,—স্থান আধেয়। স্থান নিষ্ক্রিয় জড়,—কাল উহার শক্তি অধিষ্ঠাত্রী প্রাণ-দেবতা। কালই স্থানের অঙ্গে মাহাত্ম্যের বৈচিত্র্য ফলায়, কালই সেই মাহাত্ম্যের প্রভাবে জীব-জগতের দেহে ও প্রাণে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ঘটায়। স্থান, নূতন নূতন স্তরের ভিত্তি-স্থাপন উপযোগী উপকরণ লইয়া, উপবিষ্ট থাকে; কাল মহা-মনঃ-শক্তির প্রতিনিধিরূপে জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, সেই উপকরণে নূতন স্তরের ভিত্তি স্থাপন করে এবং সুদক্ষ ও সুনিপুণ কারুর ন্যায় একসঙ্গে যোগ ও বিয়োগ—সৃষ্টি ও লয় প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমে স্থিতিরূপী এক একটা বিস্তৃত স্তর গড়াইয়া তোলে। আমরা আবারও বলি, কালই জগতের অদ্বিতীয়

নিয়ামক। অতএব আমরা এই পরিচ্ছদের উপসংহারে ঐ মহা-মহিমময় কাল ও কালের অধিষ্ঠাত্রী মহামহিমময়ী মনঃ-শক্তিকে অবনত মস্তকে ও যুক্তকরে কোটি কোটি প্রণাম করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র-জাগরণ।

কাল জগতের নিয়ামক। মনঃ-শক্তি সেই কালের নিয়ামিকা। অনাদি, অনন্তা, মহামহিমময়ী মনঃ-শক্তিই জগতের নিত্য-স্থায়িনী আদিকর্ত্রী। এই ইচ্ছাময়ী মহাশক্তির ইচ্ছায়ই কালের প্রভাব অমোঘ; এবং অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালের কর-ধৃত ক্রীড়নক। এই শক্তির সঞ্চার, সংক্রমণ বা অধিষ্ঠান হেতুই কালের কলেবরে মহিমার অমন বিশ্ব-গ্রাসি সামর্থ্য, এই শক্তির চরণাশ্রয় লাভেই স্থানের অঙ্গে মাহাত্ম্যের এই ঐন্দ্রজালিক আভরণ, এবং এই শক্তির জগন্মঙ্গল্য বিধানেই সৃষ্টির শরীরে অনন্ত বৈচিত্র্যের বিনোদ-বিলাস।

এই মনঃশক্তি কি?—জগতের তাত্ত্বিকগণ অনন্ত কাল হইতে, এই তত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত ও বিভোর। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ কঠোর সাধনা বলে, হৃদয়ে ইহার ক্ষণিক আভাস পাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন; কিন্তু ইহার অন্ত পাওয়া

মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমার আমার সঙ্কীর্ণ মনঃ-শক্তি, অথবা মানব-জগতের একীভূত মনঃ-শক্তির বিশ্লেষণ দ্বারা এই শক্তির সম্যক্ পরিজ্ঞান বা পরিচয় লাভ অসম্ভব। মহতী মনঃ-শক্তি সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া, জগতের বহির্ভূত অনন্ত ব্যোম ও কালের অনন্ত পরিধি, সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া চির বিরাজমানা ও নিত্য-ক্রিয়াশীলা। এই মনঃ-শক্তি ও মানবীয় মনঃ-শক্তি এক কথা নহে। এক কথা না হইলেও, বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তে একই প্রকৃতির পদার্থ; এক না হইলেও, ঐ মহা মনঃ-শক্তিরই অঙ্গীভূত জ্যোতির্ব্বিন্দু বা চৈতন্য-কণিকা।

জগদ্ব্যাপি মহা মনঃ-শক্তি বা চিৎ-শক্তি সমুদ্র স্বরূপ; সমগ্র মানব-জগতের একীভূত মনঃ-শক্তি, সেই সমুদ্রোত্থিত একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। মানবীয় ব্যক্তিগত মনঃ-শক্তি, ইহার সহিত তুলনায় কত ক্ষুদ্র ও নগণ্য, তাহা মনেও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই হিসাবে নগণ্য হইলেও, পৃথিবীতে মানবীয় জীবনে উন্নতির বিবিধ স্তর-গঠনে, ইহা সেই মহতী মনঃ-শক্তিরই কণিকারূপে যে এক অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বা অপরিহার্য্য সাধন, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক মনুষ্যই, কালাধিষ্ঠাত্রী এই মহিমময়ী মনঃ-শক্তির নিকট বিশেষ বিশেষ জীবন-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, চিৎ-শক্তির দেহবদ্ধ প্ররোহের ন্যায়, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, এবং জীবনের স্তর-সংগঠনে বিধি-নির্দ্দিষ্ট আপন আপন মন্ত্রের উদ্বোধন বা জাগরণ দ্বারা, শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিয়া, যথাকালে অন্তর্হিত

হইয়া যায়। এই অধ্যায়ে এই মন্ত্র-জাগরণই আমাদিগের আলোচ্য কথা ও বিবেচ্য বিষয়।

প্রথম কথা—মন্ত্র। মন্ত্র বেদে এক—তন্ত্রে আর; এবং মন্ত্রণা-গৃহে উহা সম্পূর্ণরূপেই আর একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। বেদ-মন্ত্র বলিলে, মন্ত্র নামক বেদের এক অঙ্গ বা পরিচ্ছেদ বিশেষকে বুঝায়। তন্ত্রের মন্ত্র বা বীজ ইষ্টদেবতার নাম, কল্পিত মূর্ত্তি বা গুণবোধক এক, দুই বা ততোধিক বর্ণ বা অক্ষর। তন্ত্রোক্ত কতকগুলি বশীকরণ বাক্যও মন্ত্র নামে পরিচিত। যে মন্ত্র ওঝা ও বিষ-বৈদ্যদিগের সম্বল, সেগুলি কিন্তু এই সকলের অন্তর্নিবিষ্ট নহে। মন্ত্র শব্দের আর একটা প্রসিদ্ধ অর্থ আছে। সেই অর্থ—মন্ত্রণা বা পরামর্শ। এই অর্থ হইতেই প্রধান প্রধান রাজ-সচিবের নাম মন্ত্রী। মন্ত্র অনেক প্রকার। কিন্তু প্রায় সর্ব্ববিধ মন্ত্রের সহিতই, মন্ত্র-গুপ্তি, মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন বা মন্ত্র-জাগরণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বেদ-মন্ত্র একমাত্র ব্রাহ্মণের সংস্কার-পূত রসনা দ্বারা উচ্চার্য্য, এবং তাদৃশ লোকেরই সংস্কার-পূত শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রোতব্য। এতদ্ভিন্ন অন্যের পক্ষে উহার উচ্চারণ ও শ্রবণ উভয়ই নিষিদ্ধ। ইষ্ট-মন্ত্র গুরুদেব একবার মাত্র শিষ্যের কাণে কহিয়া দেন, সে শুনিয়া রাখে; কিন্তু সে ঐ মন্ত্র মুখ ফুটিয়া আর কাহারও কাছে বলিতে পারে না; বলিলে, মন্ত্রের সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। অন্যের কাছে বলা দূরে থাকুক, মন্ত্রদাতা গুরুর নিকটে, এমন কি, নির্জ্জনে নিজের কাছেও, শ্রবণ-যোগ্য-স্বরে, উহার পুনরু-

চ্চারণ অবৈধ ও অসঙ্গত। কথিত আছে যে, বশীকরণ কি ঝাড়া-পোঁচার মন্ত্রও যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, সেই সকল মন্ত্রের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। মন্ত্রণারূপী মন্ত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা। মন্ত্র-গুপ্তি রাজকীয় ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ; এবং প্রধানতঃ এই মন্ত্র-গুপ্তির মাহাত্ম্যেই মন্ত্রীপদের অমন দায়িত্ব, গুরুত্ব ও গৌরব।

একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও ধারণাদি দ্বারা, মন্ত্রকে শক্তিশালী ও ফলপ্রদ করিয়া লইতে পারিলেই, মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন বা মন্ত্র-জাগরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধ্যানযোগে বা সাধনা দ্বারা ইষ্টমন্ত্রের সহিত তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলেই, ইষ্টমন্ত্রের জাগরণ বা চৈতন্য-সম্পাদন হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রকার মন্ত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চৈতন্য-সম্পাদন বা জাগরণের ব্যবস্থা আছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা যে মন্ত্রের কথা বলিতেছি, তাহা উল্লিখিত কোন মন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত নহে;—সর্ব্বতোভাবেই স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু তাহার সহিতও মন্ত্র-গুপ্তি ও মন্ত্র-জাগরণের অমনই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান; সে মন্ত্রও মন্ত্র-গুপ্তি ও মন্ত্র-জাগরণের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া পড়িলে, একবারেই অসার ও অবস্তুর ন্যায় ব্যর্থ ও নিস্ফল হইয়া যায়।

জগতে বিনা প্রয়োজনে কিছুই নাই; বা বিনা প্রয়োজনে কিছুই থাকিতে পারে না। যাহা আছে, তাহাই আত্ম-অস্তিত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বা প্রয়োজন লইয়া আছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কীটাণু বা একগাছি নগণ্য তৃণও উদ্দেশ্য-শূন্য

নহে। যে জগতে একগাছি তৃণ বা একটি কীটাণুরও একটা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য-জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাই, ইহা নিতান্তই অসার কল্পনা বা অযৌক্তিক কথা। তবে এ কথা ঠিক্ যে, জড় বস্তু এবং ইতর প্রাণীদিগের অস্তিত্বের উদয়, স্থিতি ও লয়, যে উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়মিত, সে উদ্দেশ্যের কোন তত্ত্ব উহারা নিজেরা রাখে না ; জগৎ শক্তির চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, যন্ত্রের ন্যায়, পরিচালিত হয় মাত্র। কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে সে কথা নহে ; মনুষ্য চিরদিনই সেই উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিতে উৎসুক। যে শক্তি দ্বারা তাহার অস্তিত্ব নিয়মিত, তাহার হৃদয়, মন ও প্রাণ, চিরদিনই সেই শক্তির চরণে প্রণত রহিবার নিমিত্ত অধীর ও আকুল। সে একদিকে যেমন জগন্নিয়ামিকা জগন্ময়ী মহাশক্তির কর-ধৃত পুতুল, অন্যদিকে আবার তেমনই আত্মগত স্বাধীন ইচ্ছার বশে, নিত্য-ক্রিয়ান্বিত কর্ম্মবীর। এস্থলে ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্লোকটি এই—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

—ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহধারী জীবাত্মাগুলিকে কর-ধৃত পুতুলের ন্যায়, উদ্দেশ্যের অনুরূপ পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন। এই মায়া হইতেই স্বাধীন ইচ্ছার উৎপত্তি। মানুষ এই মায়ার বশেই, আত্ম-অস্তিত্বের সেই মহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের পথে পরি-

চালিত হইবার সময়েও, কখন কখন, স্বাধীন ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি হেতু এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বিড়ম্বিত হয়, এবং বিড়ম্বিত হইয়াও আবার ফিরিয়া পথ লইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্য-জীবনে অশেষবিধ বৈচিত্র্যের সংঘটন হয়, এবং এই বৈচিত্র্যেই মনুষ্য-জীবনের মাহাত্ম্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

মনুষ্য যেমন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বা সত্ত্বা,—মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও তেমনই উচ্চতম। সমগ্র মানব-জীবনের সমবেত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি, তাহা অবধারণ করা এক প্রকার অসাধ্য। সে তত্ত্ব অবশ্যই মনুষ্য-বুদ্ধির অনধিগম্য, চির অজ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু সমগ্র মানবীয় অস্তি-ত্বের যেমন একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, তেমন ব্যক্তিগত ভাবে, প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনেও আবার এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য বা স্থির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জগৎ-যন্ত্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা এমনই অভ্রান্ত ও বিচিত্র কৌশলময়ী যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র লক্ষ্য কোন অংশেও সমবেত মহালক্ষ্যের প্রতিকূল বা বিরুদ্ধচারী হইয়া, বেশী সময় তিষ্ঠিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না। সমস্ত স্বতন্ত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেরই শেষ পরিণতিতে সেই জগৎ-ব্যাপক মহালক্ষ্যেরই পরিপোষণ বা পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি-গত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেরই বহিঃ-পরিস্ফুট ফল ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকগণ বলেন,—"Every man has a mission."—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের একটা বিশেষত্ব,—

বিশেষ প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য আছে। ঐ বিশেষত্ব রক্ষা বা কর্ত্তব্য পালনের উপযোগি শক্তি—সামর্থ্যও তাহার আজন্ম সঙ্গী। ভগবদ্‌গীতার ভাষায় এই বিশেষত্বেরই নাম স্বধর্ম্ম, এবং এই বিশেষত্বের পানে তাকাইয়াই, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—ইত্যাদি স্বধর্ম্মের গুণবাচক উক্তি গীতাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিশেষত্বের ফলেই, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র। কেহ শিবিকা-বিহারী ভাগ্যবান্; কেহ বা সেই শিবিকার বাহক—ক্লিষ্ট কাঙ্গাল। কেহ অট্টালিকাধিষ্ঠিত পূজাস্পদ নায়ক; কেহ বা সেই অট্টালিকার দ্বারস্থ অনুগ্রহ-প্রার্থী বা কৃপা-ভিখারী পূজক বা সেবক। কেহ মহাজনের উচ্চ গদিতে সমাসীন, বীজন-বায়ু-সেবিত নবনীত-কোমল-তনু, সর্ব্ববাদিসম্মত শোষক; কেহ বা চৈত্রের রৌদ্র-ক্লিষ্ট, শ্রাবণের ধারায় উদ্বেজিত চির-নিগৃহীত কৃষক। এই সকল বিশেষত্বের হেতু, সময় সময়, সমাজের বিকৃতি বা সামাজিক ব্যবস্থার অস্বাভাবিক পরিণতি হইতে সমুদ্ভূত সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও, এই সকল বিশেষত্বের আদিমূল যে ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃতি-প্রদত্ত বা বিধি-নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অবহেলার সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্বাভাবিক বিকাশে জগতে যে সকল দিক্‌পাল সদৃশ ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে অবসন্ন হইতে হয়। ব্যক্তিগত বিশেষত্বের উপযুক্ত বিকা-

শের ফলেই, ধীবর-পালিত কন্যার অপাংক্তেয় কানীন পুত্র জগৎ-পূজ্য বিগ্রহ, বা "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং"—এই দেব-দুর্লভ আখ্যায় ভুবন-বিখ্যাত; ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র-বল ও ভুজ-বল-রক্ষিত রাজ-সিংহাসনের ছায়ায়, বিশ্বামিত্রে মুনি-বৃত্তি বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অঙ্কুর-উদ্গম ও ব্রাহ্মণের নিভৃত যজ্ঞাগারে বা তপস্যার পর্ণ-কুটীরে পরশুরামের প্রলয়-পরশুর ভীষণ ঝনৎকার! এই বিশেষত্বের ফলেই দ্রোণাচার্য্যের লোক-ভয়ঙ্কর শঙ্খ-ধ্বনিতে কুরুক্ষেত্র নিনাদিত; নিষাদ-পল্লীতে গুহ-কৃত রাম-জয়-দুন্দুভির আনন্দ-নিক্কণ; এবং দৈত্যকুলের প্রখর মরু-প্রান্তরে প্রহ্লাদের ভক্তি-প্লাবন! রঙ্গ-গৃহস্থিত নগণ্য নটের মস্তিষ্কে শেক্ষপীয়রের প্রতিভা-স্ফুরণ এবং কর্শিকার কাননাকীর্ণ শৈশব-দোলা হইতে রাজরাজেশ্বর বোনাপার্টির শক্তি-সঙ্কলন, ইহাও ঐ বিশেষত্বেরই স্পষ্ট পরিস্ফুট ফল। জগতের ইতিহাস খুঁজিলে, ঈদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু প্রমাণ স্বরূপ যে কএকটি ভুবন-বিখ্যাত নামের উল্লেখ করা গেল, বোধ হয়, তাহাই এ অংশে যথেষ্ট।

পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকগণ যাহাকে মিশন্ (mission) নামে অভিহিত করিয়াছেন,—ভগবদ্গীতা ভঙ্গি ক্রমে ব্যক্তি-নিষ্ঠ স্বধর্ম্ম বলিয়া, যাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিশেষত্বই আমাদিগের এই মন্ত্র-জাগরণ-প্রকরণের মন্ত্র। সুতরাং, অন্যান্য মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের কিরূপ পার্থক্য, পাঠক তাহা এইক্ষণ অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যই

আপন আপন স্বভাবের অনুরূপ বিশেষত্ব লইয়া, অথবা জীবনের মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এই দীক্ষা গ্রহণের সময়—জন্ম-মুহূর্ত্ত। জগজ্জীবন, জগন্ময়, অনন্ত-দেব এই মন্ত্রের মন্ত্রদাতা গুরু। কুল-গুরু, যে শিষ্যের বংশে যে মন্ত্র চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অবগত আছেন ; মন্ত্রদান সময়ে, তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে তাহার কুল-পরম্পরাগত সেই কৌলিক মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র প্রদান করেন না। জগদ্‌গুরু জন্ম-মুহূর্ত্তে জীবনব্যাপি সাধনার জন্য যাহার প্রতি যে মন্ত্রন্যাস করিয়া দেন, সে মন্ত্রের সহিতও ঐরূপ কৌলিক সম্পর্ক একবারে না থাকে, এমন নহে। কিন্তু যেমন কৌলিক সম্বন্ধ থাকে, তেমন তদতিরিক্ত আরও কিছু থাকে। অতিরিক্ত যে টুকু থাকে, সেই টুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৌলিক গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র অক্ষর বা শব্দ মাত্র। সেই অক্ষর বা শব্দে কল্পনা-বলে শক্তির আরোপ করিয়া লইয়া, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়। জগদ্‌গুরুর প্রদত্ত জীবন-মন্ত্র অক্ষর বা শব্দ নহে,—উহা জীবন্ত-শক্তির সূক্ষ্ম বীজ বা অণু। সেই বীজ বা অণু জীবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনদাতা গুরুদেব, জীবের অস্থি, মজ্জা, শোণিত, এবং হৃদয়, মন ও প্রাণের তন্তুতে তন্তুতে উপ্ত করিয়া দেন। সেই শক্তির বীজ জীবন-ব্যাপি সাধনায় ক্রমে স্ফুরিত হইয়া, কার্য্যরূপে প্রকট হয় এবং জগতে,—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, যেরূপ স্তরের ভিত্তি স্থাপন বা পুষ্টি সাধন করিয়া, যেরূপ শক্তির পরিচয় প্রদান করে, তদনুরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে

মন্ত্রের উদ্বোধনে চারিদিক্ অশনি-নির্ঘোষে বিকম্পিত হয়, এবং শোণিত-প্রবাহে আতঙ্কের তরঙ্গ কল্লোলিত হইতে থাকে, অথবা শ্মশান-ভস্মে শবাসনে ভয়ঙ্কর শব-সাধনায় যাহার সিদ্ধি, জগৎ সেই মন্ত্রকে শক্তি-মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের সাধনাকে শক্তি-সাধনা বলিয়া সভয়-সম্ভ্রমে নমস্কার করে। যে মন্ত্র সাধকের হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু তুলিয়া দিয়া, চিতা-ভস্মে তাঁহার অঙ্গরাগ করাইয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজায় ও পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকূট সঞ্চিত করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত করে, এবং পরের গলায় মণি-হার জড়াইয়া দিয়া, আপন কণ্ঠে ফণী-হার দোলাইতে শিক্ষা দেয়, জগতের মঙ্গল যে মন্ত্রের সারসম্বল, মানুষ সেই মন্ত্রকে শিবমন্ত্র এবং উহার সাধনাকে শিব-সাধনা বলিয়া, উহার অভ্যুদয় স্থানে আনন্দে গাল-বাদ্য করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। যে মন্ত্রে গণতার বন্ধন ও একতার মালা গ্রথিত হয়; এবং চির-সেবার্ত নায়ককে সেবা-বৃত্তিতে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরাগী করিয়া তোলে; জগৎ সেই মন্ত্রের বিকাশে, গাণপত্য ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া, উহাকে গাণপত্য মন্ত্র নামে সংবর্দ্ধনা করিতে ভালবাসে এবং তাদৃশ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির কক্ষে সিদ্ধির ঝুলি তুলিয়া দিয়া, আনন্দ-ভরে কর-তল-ধ্বনি করিয়া কৃতার্থ হয়। যে মন্ত্রের পরিস্ফুরণে শক্তি জাগুক, কি নিদ্রিত রহুক, ঋদ্ধি সিদ্ধি ফলুক বা না ফলুক, কিন্তু প্রেম ও ভক্তির মন্দাকিনী, গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া, হর-জটার জটিল-বর্ত্ম পার হইয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়, যাহার উচ্ছ্বসিত বেগে মত্ত ঐরাবতও তৃণের ন্যায়

ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়, যাহার স্পর্শে ভস্ম মানুষ ও মানুষ দেবতা হইয়া উঠে, জগৎ সেই মন্ত্রকেই বৈষ্ণব মন্ত্র ও উহার উপাসককেই বৈষ্ণবরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, উহার নিকট গল-লগ্নী-কৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণত হয়, এবং সেই মন্ত্রবল-সমুদ্ভূত পুণ্যময় আনন্দ-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পারিলেই জীবন সার্থক হইল মনে করে।

পৃথিবীতে,—সময়ের বেলা-ভূমিতে জাতীয় জীবনের উন্নতি-স্তরে, যাঁহারা আপন আপন পদ-চিহ্ন দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলই উল্লিখিত কোন না কোন মন্ত্রের উপাসকরূপে জগতে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আত্ম-জ্ঞান-বলে সেই মন্ত্রের প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়া, উহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃতি-প্রদত্ত আপনার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সম্যক্ বুঝিয়া—আপনার স্বধর্ম্ম কি, তাহা ঠিক্ করিয়া লইয়া তদনুরূপ জীবন-মন্ত্রের সাধনায় দৃঢ়চিত্ত ও অনন্যমনে ব্রতী হইতে পারেন, এবং মন্ত্র-গুপ্তি রক্ষা করিয়া, মন্ত্রের উদ্বোধন বা জাগরণে কৃত-সঙ্কল্প হন, তাঁহার মন্ত্র নিশ্চিতই জাগরিত হয়, এবং সেই মন্ত্রের জাগরণে সমগ্র জগৎই যেন ক্ষণ-কালের তরে কি এক অভূতপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারে সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠে।

জগতের অতীত পুরাবৃত্ত ও পুরাণ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখা যায় যে, এক এক জন লোক

এক এক প্রকার মন্ত্র-জাগরণে ব্রতী হইয়াছেন। কাহারও কাহারও হাতে আবার অসাধারণ শক্তির মাহাত্ম্যে, কখন কখন এক সঙ্গে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ মন্ত্র জাগরিত হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্য, বলরাম, ভীষ্মার্জ্জুন এবং আলেক্‌জাণ্ডার ও সীজার প্রভৃতি শক্তি-মন্ত্রের উপাসক শাক্ত। ইঁহাদিগের জীবন-ব্যাপী মহা সাধনায় শক্তি-মন্ত্রের উদ্বোধন বা জাগরণ ষোড়শোপচারে সংঘটিত হইয়াছিল। লোকাতীত পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় শাক্ত বটেন; কিন্তু তাঁহারা শুধুই শাক্ত নহেন,—তাঁহারা যেমন শাক্ত, তেমন বৈষ্ণব,—যেমন বৈষ্ণব, তেমনই শৈব ও গাণপত্য। তাঁহাদিগের মধ্যে এক সঙ্গে সর্ব্ববিধ মন্ত্র জাগরিত হইয়াছিল বলিয়াই, তাঁহারা লোকাতীত পুরুষ বা ভগবানের অবতার ও মানবীয় উন্নতি-স্তরের উচ্চতম গ্রামের পথ-প্রদর্শকরূপে জগৎ-পূজ্য। তাঁহাদিগের কোদণ্ড-টঙ্কার ও পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে, একদিকে নিদ্রিতা মহা-শক্তি শাক্ত মন্ত্রের উদ্বোধনে নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, অন্যদিকে আত্ম-ত্যাগের কঠোর-ব্রতে শৈব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে; তৃতীয় দিকে, দয়া ও প্রীতির সুমধুর মুরলী-নিঃস্বনে ক্ষমা ও দয়া-ধর্ম্মী বৈষ্ণব-মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন হইয়াছে; তাঁহাদিগের সেই বৈষ্ণব মন্ত্রের জাগরণে যমুনা উজান বহিয়াছে,—পাষাণ গলিয়া মানুষ হইয়াছে। আর একদিকে তাঁহাদিগের পরার্থিনী প্রীতি সন্ধুক্ষিত হইয়া, গাণপত্য মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া

বনের পশু অথবা পশু-ভাবাপন্ন বন্যজীবী বর্ব্বরেরা গলায় গলায় গ্রথিত হইয়াছে ও রাম-জয়-রবে পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। এই মন্ত্রই যুগান্তরে ছাপ্পান্নকোটি যদু-বংশকে এক সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া এক বিগ্রহবৎ ঘুরাইয়াছে, ফিরাইয়াছে ও একই কেন্দ্রে অবিচলিত রাখিয়া জগতে মন্ত্র-শক্তির অপার মহিমা প্রচারিত করিয়াছে। আধুনিক ইতিহাস-কীর্ত্তিত ক্ষুদ্র নেপোলিয়নের সাধনায়ও পাশ্চাত্য জগতে অভূত-পূর্ব্ব প্রতিভার স্ফুরণে, শাক্ত ও গাণপত্য মন্ত্র এক-সঙ্গে একবারে জাগরিত হইয়াছিল। আমেরিক ও পাশ্চাত্য জগতের পার্কার, চ্যানিং, ওয়াশিংটন্ প্রভৃতিও অল্পাধিক মাত্রায় গাণপত্য মন্ত্রেরই উপাসক; গাণপত্য মন্ত্র-জাগরণেই তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-মন্ত্রের জাগরণ বা উদ্বোধনে যাঁহারা জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই মন্ত্রই তাঁহাদিগকে এখনও সজীব জনের ন্যায়, মঠে, মন্দিরে, ও গির্জ্জায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। তাঁহাদিগের নাম যোগ-মগ্ন বুদ্ধ, কাহারও নাম ক্রুশ-বিপন্ন খৃষ্ট এবং কাহারও কাহারও নাম প্রেমোন্মাদ চৈতন্য।

সকল শ্রেণীর মন্ত্রেরই অসংখ্য উপাসক আছে। সে সকলের তালিকা সংগ্রহ করা নিস্প্রয়োজন; দৃষ্টান্ত স্থলে উপরে যে কয়েকটি নামের উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ হয়, তাহাই সে পক্ষে প্রচুর। মন্ত্রের প্রধান প্রধান কয়েকটি

প্রকার বা শ্রেণীমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রের বৈচিত্র্য অনন্ত ও অসংখ্য। মন্ত্রের সাধনায় জগতে যাঁহারা অসাধারণশক্তি-মাহাত্ম্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মন্ত্র-দীক্ষা যে শুধু তাঁহাদিগেরই হইয়াছিল, অন্য সকলে অদীক্ষিত জীবন যাপন করিয়া, নিরর্থক আসিয়া নিরর্থক চলিয়া গিয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। জীবন-মন্ত্রের প্রকার যেমন অসংখ্য ও অনন্ত, দীক্ষিতের সংখ্যাও তেমনই অগণ্য ও অনন্ত। যে জন্মে, সেই কোন-না-কোনরূপ জীবন-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আইসে, এবং যে সেই দীক্ষিত মন্ত্রে সাধনার পথ লইতে পারে, জগতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, ও মানবীয় জীবন-স্তরে তাঁহারই পদ-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া রহে। এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিদ্যালয় বা বিপণি, কুলিডিপো বা কারু-কারখানা, রণাঙ্গন বা প্রচার-প্রাঙ্গণ, ধর্ম্মাধিকরণ বা মন্ত্রণা-গৃহ, রাজ-প্রাসাদ বা যোগাশ্রম, যে স্থানেই হউক না কেন, মন্ত্র-দীক্ষার অনুরূপ সাধনার পথ খুলিলেই, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য ও সার্থকতা। জীবন-মন্ত্রের মহাসধনায় সকলেই রামচন্দ্র বা বোনাপার্টি হইতে পারিবেন, চিরবৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টির পক্ষে ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক কথা, বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কল্পনা। পৃথিবী তাহা হইলে, তাহার অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন রামচন্দ্রের অযোধ্যা বা নেপোলিয়নের ফ্রান্স হইয়াই চির পরিতৃপ্ত রহিত। কিন্তু, প্রকৃত কথা তাহা নহে। রাম বোনাপার্টি প্রভৃতি অবতারকল্প যুগ-পুরুষদিগকে আদর্শ বিগ্রহ-

রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনেরও সংবাদ লইতে হইবে। বস্তুতঃ যে যে শ্রেণীর মন্ত্র লইয়া অবতীর্ণ, তাঁহার তদনুরূপ সিদ্ধি-লাভ ঘটিলেই হইল। তাহা হইলেই, তাহার পক্ষে মন্ত্র-জাগরণরূপ কর্ত্তব্য-পালন সম্পন্ন হইল, বুঝিয়া নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত রহিবার অধিকার পঁহুচিল।

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকের জীবনেই এক একটা নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র আছে ; এবং সেই মন্ত্র-সাধনের উপযোগি শক্তি-সম্পদ্‌ও প্রত্যেক জীবনেই নিহিত আছে। সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম কার্য্য সেই মন্ত্রের উদ্ধার সাধন—অর্থাৎ মন্ত্রের প্রকৃতি অবধারণ। ইহা খুবই সহজ কথা নহে। অনেকেই আপনার নির্দ্দিষ্ট দীক্ষা-মন্ত্রের পরিচয় না পাইয়া, জীবনে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ শাক্ত-ধর্ম্মী হয়ত বুদ্ধির বিপাকে বৈষ্ণব-মন্ত্রের আশ্রয় লইয়া, ঢক্কা-নিনাদে বা অশনি-ঝঙ্কারে ভক্তি-প্রাণা প্রেমের বাঁশী বাজাইতে যাইয়া বিপন্ন হয়, অথবা স্বভাব-বৈষ্ণব শাক্তের শব-সাধনায় নিরত হইয়া প্রেমের বাঁশীতে তান ধরে এবং অস্বাভাবিক বংশী-রবে ভৈরব ও ভৈরবীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, সূচনায়ই কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া জীবনে বিফল-প্রয়াস ও হতাশ হইয়া পড়ে। এই হেতুই বলি, মন্ত্র-জাগরণ-ব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রথম কঠিন কর্ম্ম মন্ত্রের উদ্ধার সাধন বা মন্ত্রের প্রকৃতি অবধারণ।

দ্বিতীয় কর্ম্ম মন্ত্র-গুপ্তি। মন্ত্রের উদ্ধার হইলে,—মন্ত্রের প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারিলে, মন্ত্রটিকে অতি গোপনে রক্ষা করিয়া, তদনুরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সিদ্ধিলাভের

পূর্ব্বে মন্ত্রের ভেদ বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, বস্তুতই মন্ত্র-শক্তি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়; সাধনার পথে অনন্ত বাধা ও বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ চারিদিক হইতে পরিহাস ও বিদ্রূপের অসংযত কটাক্ষ সঞ্চালিত হইয়া, সাধককে গতি-পথে আকুলিত করিয়া তোলে। ইহার পরে ঈর্ষ্যা, হিংসা ও দ্বেষ আসিয়া তাহার প্রতি অজস্র ধারায় বিষ-বাণ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কপট বন্ধুতা, তীক্ষ্ণ-বিষ-দংশনে অবসন্ন করিবার নিমিত্ত, কালসাপিনীর ন্যায় নীরবে ফণা বিস্তার করিয়া, প্রস্তুত হইতে থাকে। অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্মুখ সংগ্রামে হানা দিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হয়। কেহ যদি অগ্রে ঘোষণা দিয়া, আত্ম-জীবনে রামের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, অন্য দূরে থাকুক, সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রাণাধিক সোদর লক্ষ্মণই তাহার হাতের কোদণ্ডটি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। কোন সুহৃদ্ বা মিত্র কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিয়া, নিগড় করে লইয়া তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। জীবনের মন্ত্র, ঘোষণা দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, সিদ্ধির পূর্ব্বে, আকার ইঙ্গিতে উহা আভাসিত হইলেও প্রমাদ। আকার ইঙ্গিতে জীবনের ইষ্ট-মন্ত্র আংশিক ব্যক্ত হইতে দিয়াছিলেন বলিয়াই, ফটোগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা সেই প্রসিদ্ধনামা পুরুষ, প্রিয়তমা পত্নী কর্ত্তৃক উন্মাদ নামে অভিহিত ও পাগ্‌লা-গারদে প্রেরিত হইয়াছিলেন! বস্তুতঃ মন্ত্র-গুপ্তি সর্ব্বপ্রকার সাধনারই এক অতি বড় প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গ।

তৃতীয় কর্ম্ম মন্ত্র-জাগরণ, এবং চতুর্থ—সাধনা ও সিদ্ধি। মন্ত্র-জাগরণই এই পরিচ্ছেদের প্রধানতম লক্ষ্য। এইক্ষণ সেই মন্ত্র-জাগরণরূপ দুরূহ সাধনা সম্বন্ধেই আমাদিগের বক্তব্য নির্দ্দেশ করিব। এই কঠোর সাধনার প্রধানতম সাধন বা উপায় ধ্যান। মন্ত্র-জাগরণ ও ধ্যান, এক অর্থে একই কথা। ধ্যান মনের শক্তি মনের কার্য্য। মন মানবীয় অস্তিত্বের উচ্চতম সম্পদ্। মনের প্রসাদেই মানুষ—মানুষ। মনঃ-শক্তির বিকাশে মানুষ কখনও দেবতা হইয়া বরাভয়-কর-সঞ্চালনে পৃথিবীকে আশ্বাসিত করে, কখনও বা দৃপ্ত দানব-মূর্ত্তিতে বিকাশিত হইয়া জগৎকে আকুলিত করিয়া তোলে। সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ মানবীয় মন। ধ্যান সেই মনের শ্রেষ্ঠতম গুণ, বা শক্তির আভরণ।

ঐ যে অনন্তকোটি-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত বিপুল সৌর-জগৎ, জগৎ-প্রাণ সবিতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, অনাদি কাল হইতে, আপনার নির্দ্দিষ্ট গতিপথে ধাবিত হইতেছে, এবং অনন্তের অনাদি তানের সহিত আপনার ঐকতানিক মোহন স্বর মিশ্রিত করিয়া, এক বিচিত্র সঙ্গীত গাইয়া যাইতেছে,—উহা যেমন সুন্দর ও মহৎ, অতীন্দ্রিয় সুন্দর অনন্ত শক্তির চৈতন্য-কণিকা পৃথ্বী-চারী মনুষ্যের মনও, ধ্যান ও অনুভূতির অতুল সম্পদে, তেমনই অভাবনীয়রূপে মহান্ ও সুন্দরের অত্যাশ্চর্য্য সম্মিলন। একদিকে, প্রাতঃ-সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত ও সুধাংশু-কিরণ-স্নাত শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী, প্রকৃতি-রাণীর ষড়-ঋতু-বিলসিত অনুপম শোভা-সম্পদ্ প্রদর্শন করিতেছে; অন্যদিকে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-

শ্রেষ্ঠ কিংবা যাবতীয় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ মন তাহা দেখিয়া আপনার করিয়া লইতেছে। কোথাও তুষার-শোভী অভ্রভেদী পর্ব্বত, স্থানে স্থানে উপল-বাহিনীর গম্ভীর শব্দে মুখরিত, কোথাও বা দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের নীলিমা-চুম্বি উত্তাল-তরঙ্গময় ফেণিল সিন্ধু, কোথাও বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-সমাকুল নানাবিধ বিচিত্র ও মনোহর পাদপ-লতিকাপূর্ণ অরণ্যানী। মনই প্রাকৃত জগতের এই সকল বাহ্য ও অন্তর্নিহিত শোভা উপলব্ধি কিংবা ইহার নিয়ম অথবা অনুশাসন-অনুভূতির একমাত্র কর্ত্তা। মন তাহার ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ না করিলে, দৃষ্টি, চক্ষু-প্রীণনের নিমিত্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য-রাশি মন্থন করিতে যাইত না, শ্রুতি কর্ণের তৃপ্তির জন্য বেণু-বীণা কিংবা মধুর-কণ্ঠে বিহগের ভাষাহীন অস্ফুট কাকলীর অনুসন্ধানে ধাবিত হইত না, এবং নাসিকাও সুরভি কুসুমের সৌরভ-লাভে আকুল ও অধীর হইয়া পড়িত না।

অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে কি বিচিত্র ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক! অন্তর্জ্জগতের অভাবে বহির্জ্জগৎ সর্ব্বতোভাবেই নিরর্থক; মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টা যদি মনুষ্যকে, তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিক্ষম সুখ-দুঃখের বিচিত্র তাড়নে সংক্ষুভিত মনঃ-সম্পদের অধিকারী না করিতেন, তাহা হইলে, ইহা নিঃসংশয় যে, তাঁহার মহিমা, এই প্রকার অসীম ও অতুলরূপে প্রকটিত হইত না। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর হামিণ্টন বলিয়াছেন যে, মনুষ্য, সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ এবং

সেই মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ মন। অতএব মনস্তত্ত্ব শিক্ষা ও মনঃ-শক্তির যথাযুক্ত বিকাশ-সাধনই মানুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

ভারতের আর্য্য জাতিই এই মহা কর্ত্তব্যে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আদি জননী প্রাচীন গ্রীস-ভূমিতে সভ্যতার বীজ সম্যক্‌রূপে অঙ্কুরিত হয় নাই—জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্ররূপিণী এথেন্স নগরীর চিন্তা-স্রোত ও বাগ্মিতা ইউরোপ প্লাবিত করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে নাই; তখন এই শৈল-মালা-বেষ্টিত, ভারত-মহাসাগরের নীলোর্ম্মি-চুম্বিত ভগবদ্‌ভক্তির লীলা-ক্ষেত্র প্রশান্ত প্রকৃতি ভারতবর্ষে জগৎ-পূজ্য আর্য্য তাপস-গণ মনোবিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্বগুলি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যেই, মনের উচ্চতম—সুতরাং মানুষের অতুল সম্পদ্‌,—ধ্যানের প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন, মানুষের সর্ব্বপ্রধান সম্বল মন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যাহাকে 'concentration of thought' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই মনঃ-শক্তি,—ধ্যানই মানবীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির আদি নিদান এবং জীবনের স্তর-গঠন ও তাহার অভিব্যক্তিবিষয়ক অদ্বিতীয় সাধন।

আর্য্য জাতি জড়-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মানসিক সম্পদ্‌—জ্ঞান-বলকেই জগতের সার শক্তি বোধে ঊর্দ্ধতম জগতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং জ্ঞান-বল অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর ব্রহ্মানুভূতিই, সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার-ভেদকারী নাবিকের প্রধান-

তম লক্ষ্য শুকতারার ন্যায়, তাঁহাদিগের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও অবলম্বন ছিল। তাঁহারা কখন এই জ্ঞানালোক লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, কখন বা অপার ও অতল সৃষ্টি-রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন-মানসে এবং কখন কখন বা পরম কারুণিক স্রষ্টার প্রেমাগ্নির কণিকা মাত্র হৃদয়ে অনুভব করিবার প্রত্যাশায়, ভক্তির বিশ্ব-দ্রবকারী আবরণে আবৃত হইয়া, একমাত্র ধ্যানেরই আশ্রয় লইতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহাদিগের এই নিত্য প্রাণারাধ্য ধ্যানেরই অন্য নাম—মন্ত্র-জাগরণ।

শুধু যে এই ব্রহ্মানুভূতিরূপ মহাসাধনা,—পরম সত্যের সন্ধানেই ধ্যানের প্রয়োজন, অন্য কিছুর জন্য ধ্যানের প্রয়োজন নাই, আর্য্য তাপসেরা কখনও এরূপ মনে করিতেন না। তাঁহারা ইহা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সংসারে যাহা কিছু কাম্য, তাহাই ধ্যান-সাপেক্ষ। এই হেতুই তাঁহারা রাজ্যেশ্বরের অতুল বৈভব, অখণ্ড প্রভুত্ব, পৃথ্বী-বিজয়ী বীরের বিজয়-গৌরব, গন্ধর্ব্ব-জন-সুলভ ভুবন-মোহন রূপ ইত্যাদি কোন বিষয়ের জন্যই লালায়িত হইতেন না। এই সমস্তকেই ধ্যানযোগের অনায়াস-লভ্য পদার্থ মনে করিয়া, উপেক্ষায় ফেলিয়া রাখিতেন এবং জটা-চীর ধারণ পূর্ব্বক আজীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেন। যে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা তাঁহাদিগের সাধনা-নিষ্ঠ হৃদয়ে অহর্নিশ প্রজ্বলিত থাকিত, সেই জ্ঞানের পরমা তৃপ্তির জন্য, অথবা যিনি আনন্দময় অমৃত—তাঁহাকে আত্মায় অনুভব

করিবার উদ্দেশ্যে, তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরি-শৃঙ্গে কল-নাদিনী স্বচ্ছ-সলিলা তরঙ্গিণীর মনোহর পুলিনে, কিংবা মর্ত্ত্য-নিবাসে সাম্যের অদ্বিতীয় স্থান ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার ন্যায়, তাঁহারা স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিতেন এবং একমাত্র ধ্যান-সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব-রহস্য করতলস্থ আমলকবৎ নিরীক্ষণ করিতেন।

নিষ্কাম-ব্রতী তাপসেরা স্বয়ং এইরূপে কামনাকুল সংসারকে সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া, মহাতত্ত্বের অন্বেষণে ধ্যানের আশ্রয় লইতেন; এবং যে সকল সংসার-সম্পদ্-প্রয়াসী কামনাকুল বিষয়ী কাম্য লাভ কামনায়, তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইত, তাহা-দিগকেও, সর্ব্বপ্রকার শক্তি-সঞ্চয়ে ও পুরুষার্থ লাভের মূল নিদান ঐ ধ্যানের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ধ্যানযোগের আশ্রয় লইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীস্থ সাংসারিকদিগের জন্যই প্রধানতঃ ধ্যান-যোগ শিক্ষার নিমিত্ত, শৈশব সময়ে, গুরু-গৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া, সংযত জীবন যাপনের ব্যবস্থা ছিল। এই জন্যই জিগীষা-পরতন্ত্র বীর-মন্ত্রে দীক্ষিত বীর বিশ্ব-বিজয়-কামনায়, অগ্রে ধ্যানযোগ বা তপস্যার আশ্রয় লইতেন এবং তাহাতে রাজ্য-কামুক সিদ্ধি লাভ করিয়া, অবশেষে অস্ত্র ধারণ করিতেন। এই জন্যই জটা-চীর-ধারণে যোগী সাজিয়া, রাজ্য-লাভের প্রত্যাশায়, যোগাসনে ধ্যান-মগ্ন হইতেন। এমন কি, অভিলষিত বর, পত্নী, বা পুত্র- লাভের জন্যও লোকে ধ্যান বা

মন্ত্র-জাগরণরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিরত হওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য মনে করিত।

যাহারা এপর্য্যন্তও, মনুষ্যত্বের নিম্নতম গ্রামে পঁহুচিতে পারে নাই, কিংবা যাহাদিগের শিক্ষা, দীক্ষা একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদিগের নিকট এই তত্ত্ব পাগলের প্রলাপ কিংবা বিকৃত-মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ধ্যান-সাহায্যে, মন্ত্র-জাগরণের অমোঘ-বলে অর্জ্জিত জ্ঞান-শক্তিতে অনন্ত কাল-সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে আপনাদিগের দৃঢ় পাদক্ষেপ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন,- -যাঁহাদিগের পদ-রেণু বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবী কৃতার্থ হইয়াছে,—যাঁহাদিগের মন্ত্র-বলে মানবীয় জীবনেও উচ্চতর অভিনব স্তরের উপকরণ-সঞ্চয় বা ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছে, তাঁহাদের সকলই ধ্যান কিংবা মন্ত্র-জাগরণের অচিন্তনীয় শক্তি স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা যে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বহু অসম্ভব ব্যাপারও সর্ব্বথা সম্ভবপর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহের ভাব পোষণ করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতের ঋষিগণের ধ্যান-বল বা মন্ত্র-জাগরণের অব্যর্থ কৌশল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক তত্ত্বে কতদূর প্রকটিত হইয়াছিল, উদাহরণচ্ছলে সেই সমস্ত জটিল বিষয়ের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করিলে, তাহাও সহজে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে না। অতএব আমরা এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সংক্ষেপে উহার আভাস মাত্র প্রদান করিলাম।

ভারতের ঋষি, জড়-জগৎকে উপেক্ষা করিয়া, অধ্যাত্ম-জগতের কোন-না-কোন তত্ত্ব সম্বন্ধেই ধ্যান-ধারণা বা মন্ত্র-জাগরণের দুষ্কর সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সে কথা নহে। পাশ্চাত্য দেশ প্রত্যক্ষ বিষয় বা জড়-জগতের চির-পরিদৃশ্যমান পট সম্মুখে খুলিয়া লইয়া, ধ্যান বা মন্ত্র-জাগরণের কঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাকৃত বিজ্ঞানের কএকটি বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পাঠক! তোমার চিন্তাশীল দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া, একবার ঐ আকাশের পানে তাকাইয়া দেখ। দেখিবে, ঐ যে বজ্র-সঙ্গিনী বিদ্যুল্লতা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চকিতে পরিভ্রমণ করিয়া, দাপ্তির প্রখরতায়, তোমার চক্ষু অন্ধী-ভূত করিতেছে,—চক্ষের নিমিষে একবার সুনীল মেঘের কোলে অদৃশ্য ও পর মুহূর্ত্তেই আবার তেমনই প্রদীপ্ত প্রভায় পরিলক্ষিত হইতেছে,—ঐ বিদ্যুল্লতাই, জড়-যাজী যাজ্ঞিকের প্রগাঢ় ধ্যান-সাহায্যে, কিরূপ চির-পদানতা আজ্ঞাবাহিনী সেবিকার ন্যায় তোমার প্রাত্যহিক কার্য্যে বিপুল সহায়তা প্রদান করিতেছে!—কিরূপে মানুষের অধিগম্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা নূতন স্তর-সৃষ্টি পত্তন করিয়া লইতেছে,—তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। কিংবা ঐ যে বাষ্পীয় শকট সহস্র সহস্র আরোহীকে কুক্ষিতে ভরিয়া লইয়া, প্রচণ্ডবেগে তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, এবং যেন কি এক ঐন্দ্রজালিক মোহে দূরত্বের ব্যবধান অনুভূত হইতে দিতেছে না, তাহাতেও সেই ধ্যান বা

মন্ত্র-জাগরণের মহিমাই ষোড়শোপচারে প্রকটিত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। ফটোগ্রাফ্, ফনোগ্রাফ্, রটন্‌জেন্ লাইট্ বা আলো, বিনা তারে তারের খবর প্রেরণ ইত্যাদি সভ্য-জগতের এই সমস্ত উপকরণই মন্ত্র-জাগরণের শক্তি-সম্ভূত মানবীয় জীবনের বৈজ্ঞানিক স্তর। এই সম্পদের বিষয় বলিতে গেলে অনন্ত। দিন দিনই এই শ্রেণীর বিস্ময়কর রত্ন-নিচয়ে মানুষের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতেছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তর ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের এই রত্ন উদ্ধার বা সম্পদ্-সঞ্চয়ে একদিকে ধ্যান বা মন্ত্র-জাগরণের দুরূহ প্রক্রিয়া যেমন কার্য্য করিয়াছে, তেমন উদ্ভাবনী বুদ্ধি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বিবিধ যন্ত্রাদিও তাঁহাদিগের মন্ত্র-জাগরণ-ব্যাপারে সহায়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণের মন্ত্র-জাগরণে কোনরূপ বাহ্য উপকরণের প্রায়শ তেমন প্রয়োজন ঘটে নাই। তাঁহারা অধ্যাত্ম্য-বলে এতদূর বলীয়ান্ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ধ্যান-যোগ বা মন্ত্র-জাগরণের অব্যর্থ কৌশলে, অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলিকে নিত্য-প্রত্যক্ষ স্থূল বস্তুবৎ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সভ্যতাভিমানী ইউরোপ, তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যার উচ্চতম শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া, যে সকল তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন, বহু যুগ পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ সেই সকল তত্ত্ব শ্লোকে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। যে 'সিরিয়াস্' নক্ষত্রকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা 'ডগষ্টার' নাম দিয়া নবাবিষ্কৃত

বস্তুরূপে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাকেই 'মৃগ-ব্যাধ' নাম দিয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতি যথাযথরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; যাঁহাদিগের দূরবীক্ষণাদি কোন যন্ত্র ছিল বলিয়া, ইতিহাসাদিতে কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না, সেই ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কি প্রকারে বিশ্ব-পতির কর-লেখা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়া, এই কদম্ব-কুসুম-প্রতিম পৃথিবী অপেক্ষা শতসহস্রকোটিগুণে বৃহৎ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতিবিধি নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠক! একবার স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? ধ্যান-ধারণা বা মন্ত্র-জাগরণ যেমন বিশ্ব-রহস্য উদ্ভেদ, তেমনই আত্মজ্ঞান-লাভের অদ্বিতীয়, অব্যর্থ ও মুখ্য উপায় বা পথ। যিনি যখন, জীবনের যে কোন স্তরে অবস্থিত রহিয়া ও আপনার স্বধর্ম্ম, বিশেষত্ব বা প্রকৃতি-প্রদত্ত আত্ম-গত মন্ত্রের পরিচয় পাইয়া, সেই মন্ত্রের জাগ-রণে ধ্যানস্থ হইয়াছেন এবং ধ্যান-বলে মন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন; তাঁহার কার্য্য বা অনুষ্ঠানই মানবীয় জীবন-স্তরে গ্রথিত হইয়া, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে অমর বরদানে কৃতার্থ করিয়াছে;—তাঁহার পরবর্ত্তী জনকেও ঐ পথে গতি করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিত্য প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবীয় মন অবহেলার সামগ্রী নহে। মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানে এবং মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ, মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। কিন্তু

হায়! চির-সুখ-লিপ্সু, মায়া-মোহ-মুগ্ধ, অসার বিষয়-মগ্ন গর্ব্বিত মানব এই সার সত্যের অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসুক হইবে কি?

আমরা বাহ্য চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট সভ্যতা, অকর্ম্মণ্য শিক্ষা ও হাত-গড়া অস্বাভাবিক সামাজিকতার অন্ধ অভিমানে আত্মার স্বাতন্ত্র্য জনিত অতুল বৈভবের উপযুক্ত সম্মান করিতে বিস্মৃত হই এবং জড়-প্রকৃতির বাহ্য শোভা-সম্পদ্ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু ইহার প্রাণরূপিণী মূল-শক্তির অনন্ত আভা যে আমাদিগের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা ধ্যানস্থ হইয়া কিংবা মন্ত্র-জাগরণরূপ মহতী সাধনায় মনোনিবেশ করিয়া, প্রাণে অনুভব করিবার অবসর প্রাপ্ত হই না। হায়! আমরা নগণ্য ও ক্ষুদ্র হইলেও, আমাদের বিশ্ব-গ্রাসি আত্মা যে সৌর-জগৎকে, উহার এক কোণে অনায়াসে পূরিয়া রাখিতে সমর্থ, উচ্চতায় হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও পরাস্ত করিতে সক্ষম, উদারতার বিস্তারে সমুদ্রকেও গোষ্পদ-তুল্য মনে করিতে প্রস্তুত এবং বেগে পবনকে কিংবা বিদ্যুতের গতিকেও অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিতে সামর্থ্যবান্, তাহা আমরা একবারও প্রণিধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না। রাজ-রাজেশ্বরের সম্পদ্ বক্ষে লইয়াও, কাঙ্গালের ন্যায়, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষার তরে ঘুরিয়া বেড়াই, লুক্কায়িত দেব-প্রভাব বুকে লইয়াও, আজীবন মাটীর মানুষরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে কাদায় গড়াগড়ি দিয়া ভারাক্রান্ত

জীবন অতিবাহিত করি। গিরি-ধারণ-শক্তি বাহুতে লইয়া পঙ্গুবৎ যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হই। ইহা অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা বা অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

প্রাণের নিভৃত প্রান্তরে মনুষ্যোচিত বা দেবোপযোগি উচ্চতর বা উচ্চতম বৃত্তি নিবহের যে অঙ্কুর বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষার স্বাস্থ্য-পুষ্টিকর-জল-সেকের অভাব নিবন্ধনই বল, আর নিয়তি প্রযুক্তই বল, সাধারণতঃ অনেকেই চিন্তার উন্নত গ্রামে আরোহণ করিতে অনভ্যস্ত বা অশক্ত। সাধারণতঃ তাহাদিগের মন দৃশ্য-জগতের যাবতীয় বস্তুরই তরল সৌন্দর্য্য বা বাহ্য চাক্‌চিক্য ভোগে উন্মত্ত। কারণ, যাহা একটু গাঢ়, যাহা একটু গভীর, তাহাই তাহাদিগের পরিপাক-শক্তির বহির্ভূত। তাহারা কোন বিষয়ের উপর বিশেষরূপে মনোযোগ দিতে ক্লান্তি বোধ করে; এবং কোন ভাবই তাহাদিগের মনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। এমন কি, কোন বিষয়েরই বৈচিত্র্য কিংবা গুরুত্ব, তাহাদিগের মনে স্থায়ি ঔৎসুক্য কিংবা অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্ব-রহস্য বুঝিতে অনেকেরই ক্ষণিক উৎসাহ জন্মিয়াছে; কিন্তু কয় জন সেই মহামনীষী কপিলদেবের ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া, অক্লান্ত বুদ্ধির অবিচল সাহায্যে সৃষ্টি-তত্ত্বের অতল সমুদ্রে ডুব দিতে সমর্থ হইয়াছেন? বৃক্ষ হইতে আতা-পতনরূপ নিত্য-প্রত্যক্ষ সামান্য ঘটনা, অনেকেরই চক্ষুর সম্মুখে অহোরাত্র সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু কয় জন সেই অসাধারণ

ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা নিউটনের চক্ষু লইয়া, তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছেন ? শুধু এই সকল বিশেষ শক্তিশালী উন্নত মনের কথা বলিতেছি না। মানবীয় মন মাত্রই অনন্ত শক্তির প্রস্র-বণ। জাগাইতে পারিলে, জাগাইবার সন্ধান জানিলেই, সেই শক্তিকে জাগান যাইতে পারে। সূর্য্য-কিরণ-প্রতিফলিত আতসী প্রস্তর হইতে উৎসারিত কেন্দ্রীভূত আলোক-বিন্দুর যেমন দাহিকা-শক্তি জন্মে, তেমন মনও যখন আত্ম-সংযম দ্বারা কেন্দ্রী-ভূত হইয়া, বিষয় বিশেষের উপর আপনার পূর্ণশক্তি ও আসক্তি প্রয়োগ করে, তখন তাহাতেও এক অপূর্ব্ব অন্তর্ভেদিনী শক্তির উদয় হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তিরও, সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের মীমাংসার্থ মনে যখন কোন প্রশ্নের উদয় হয়, অমনই সাধ্যমত চিন্তাকে ঘনীভূত করিতে চেষ্টা করে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্ব-লুক্কায়িত সত্য, সময় সময় আংশিকরূপে এবং কখনও বা পূর্ণমাত্রায় মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব. প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বধর্ম্মের ভাব বা জীবনের দীক্ষা-মন্ত্র ও তদ্‌বিকাশ উপযোগি শক্তি-সামর্থ্য সকলের প্রাণেই নিহিত থাকে। কিন্তু হায়! সেই মন্ত্রে শক্তি-সংযোগ, সেই মন্ত্রের উদ্বোধন বা জাগ-রণ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ? কেহ কেহ অবিকশিত বুদ্ধির দোষে, আপনার দীক্ষা-মন্ত্রের পরিচয় পাইতে অথবা আত্মগত বিশেষত্ব বুঝিয়া লইতে আজীবন অসমর্থ রহিয়া যায়। সুতরাং একবার জোয়ারের জোরে উজান চলে, আবার ভাঁটার টানে

পিছাইয়া পড়িয়া, সেই এক রকমের জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়। কেহ মন্ত্রের পরিচয় পাইয়াও, সাধনার পথ না পাইয়া, অপথে যাইয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ পথ পাইয়াও, ইচ্ছাকৃত আলস্য ও ঔদাস্যের দায়ে, পৈতৃক সম্পত্তি নীলামে উঠাইয়া দিয়া, হাতে মূলধন থাকিতেও, দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়া নিশ্চিন্ত রহে! কুল-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে অনেকেই, কিন্তু মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন, অতি অল্পলোকে। মনুষ্যরূপে যে জন্ম ধারণ করে, সেই মনুষ্য-দেহে মনের সম্পদ্ ও মন্ত্রের বীজ লইয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত কারণে মন্ত্র-জাগরণ বা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। দোষ মন্ত্রদাতা জগদ্গুরুরও নহে—মন্ত্র-গৃহীতার দুরদৃষ্ট বা পূর্ব্ব-সঞ্চিত দুষ্কৃতিরও নহে; দোষ মানবীয় মনের স্বাধীনতা বা যদৃচ্ছগতি ইচ্ছা-শক্তির। মন্ত্র-জাগরণের প্রধান উপায় জ্ঞান—এবং শ্রেষ্ঠ সাধন সেই জ্ঞান-যোগে ইচ্ছা-শক্তির সংযম ও মনের এক-নিষ্ঠতা বা একাগ্রতা সম্পাদন।

ইচ্ছা থাকিলে এবং যথার্থ যত্ন ও প্রকৃত আগ্রহের সহিত সাধনার পথ অবলম্বন করিলে, সকলেই আত্ম-জীবনে ন্যূনাধিক মাত্রায় আপন আপন মন্ত্র-জাগরিত ও প্রকৃতির মহনীয় মঙ্গল উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রকৃতি ও স্বভাব। পৃথিবীতে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমার প্রভৃতির বীণা নিনাদিত হইয়াছিল বলিয়া, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের বংশী নীরব রহে নাই। গাণ্ডীবের টঙ্কারে

কুরুক্ষেত্র কম্পিত হইয়াছিল বলিয়া, গো-গৃহে কাপুরুষবৎ বিড়ম্বিত সুখ-বিলসিত উত্তর সমরানলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বীর-ব্রত উদ্‌যাপনে কুণ্ঠিত হয় নাই। যে পৃথিবীর অযোধ্যায় রাম—সেই পৃথিবীর গোকুলে শ্যাম। যেখানে রাজরাজেশ্বর যুধিষ্ঠির,—সেই খানেই ভিখারী বিদুর। বস্তুতঃ হিমালয়ের অভ্র-ভেদী শৃঙ্গে, সূর্য্যের স্বর্ণ-রশ্মি ঝলমল্ করিতে দেখিয়া, বল্মী-কের আত্ম-অস্তিত্বে ধিক্কার দিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। যে মন্ত্রে হিমাদ্রির দীক্ষা, বল্মীকের পক্ষে সে মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া যদিও অসম্ভব, উভয়ের মন্ত্র যদিও স্বতন্ত্র, অস্তিত্বের প্রয়োজনও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি হিমাদ্রির হিমাদ্রিরূপে এবং বল্মীকের বল্মীকরূপে বিকাশেই সেই অস্তিত্বের সার্থকতা,—উহাতেই উভয়ের যথার্থ সাফল্য। বল্মীক যদি হিমাদ্রি হইতে না পারে, তাহাতে উহার কোন নিন্দা বা কলঙ্ক নাই; বল্মীক, বল্মীক-রূপে বিকশিত হইতে পারিলেই, উহার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইল, ভাবী হিমালয়ের স্তরে তাহা হইলেই আংশিক উপকরণ যোজিত হইয়া রহিল। কিন্তু বল্মীক, বল্মীক না হইয়া যদি ভস্ম-স্তূপে বিকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বল্মীক-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই হেতুই বলি, তুমি মহাসাধ-কের কঠোর মন্ত্র-জাগরণে,—দুশ্চর সাধনার বলে জীবনের উচ্চতম গ্রামে অরূঢ় হইয়া, কৃতার্থ হইতে না, পার না পারিলে, তাহাতে কোনই ক্ষোভ বা মনস্তাপের কারণ নাই। কিন্তু যে মন্ত্রে তোমার দীক্ষা, তুমি যদি সেই মন্ত্রের সাধনায় সংযতচিত্তে নিবিষ্ট

রহিতে না পার, তোমার জীবন-মন্ত্র যতই নিম্নশ্রেণীর হউক না কেন, যদি তাহাতেই তোমার মন, প্রাণ ও জীবন আহুতিরূপে সপিয়া দিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে, প্রকৃতই তুমি ব্রত-ভঙ্গ হেতু প্রত্যবায়-গ্রস্ত। তাহা হইলেই তোমার জীবন নিরর্থক ও নিস্ফল। সকলের পক্ষেই আপনাপন মন্ত্র মহাসাধনার মহা-মন্ত্রের ন্যায় আদরের বস্তু ও পূজার সামগ্রী। সকলেরই সেই মন্ত্র-জাগরণে যথাশক্তি যত্ন করা কর্ত্তব্য। আপন আপন প্রাণের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রাগত মন্ত্র জাগরিত হইলেই, জীবনের সার্থকতা। অতএব ইহাই আমাদিগের শেষ আকাঙ্ক্ষা ও বিনীত প্রার্থনা যে, সকলেই প্রাণগত মহামন্ত্র জাগরিত হই-বার সুযোগ প্রাপ্ত হউক। আমরা সকলেই পূর্ব্ব-গৌরব-স্মৃতির প্রাণোন্মাদিনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও যথার্থ মন্ত্র-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া, ভবিষ্যৎ-পুরুষের আদর্শ-স্থানীয় হইতে সমর্থ হই এবং এইরূপে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়া আসুক। জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নততর স্তরারোহণের সোপানস্বরূপ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত কথা হইয়া রহুক,—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"।

এই মহাসঙ্কল্প-বাক্যে স্বস্তিবাচন করিয়া, সমগ্র মানবজাতি-সাধারণ পরস্পর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ঘৃণা, অসূয়া ও পরশ্রীকাতর-রতা প্রভৃতি কালকূটরাশি কর্ম্মনাশার পাপ-সলিলে ভাসাইয়া দিয়া, আপন আপন মন্ত্র-জাগরণরূপ মহাসাধনায় ব্যাপৃত হইতে পারিবে ও মন্ত্র-জাগরণরূপ অব্যর্থ শক্তি-সংযোগে

আপন আপন জীবনে যথাসম্ভব সাফল্য ও সিদ্ধিলাভ করিয়া মানবীয় উন্নতি-স্তরে পদাঙ্ক-স্থাপনে কৃতার্থ হইবে এবং কাহা-কেও ভক্ত রামপ্রসাদের কণ্ঠে—"এমন মানব-জমীন রইল পতিত, চাষ করিলে ফল্‌তো সোনা"—এই অনুতাপের গীতে তান ধরিয়া, অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হইতে হইবে না। পৃথিবীর ভাগ্যে এমন শুভদিনের সুপ্রভাত কখনও হইবে কি না জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনঃ-শক্তির একীভূত সমষ্টিই মানবজাতিরূপ বিরাট পুরুষের ব্যাপক মনঃ-শক্তি এবং ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ জীবন-মন্ত্রের জাগরণেই বিরাটের ব্যাপক মন্ত্র-জাগরণ ও তৎসম্ভূত কর্ম্ম-ফলের একীভূত সমষ্টিই মানবীয় জীবনের উন্নতি-স্তর এবং বিরাটের ঊর্দ্ধতর স্তরে অভ্যুত্থানের উপায় ও আশ্রয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মন্ত্র-জাগরণ-জনিত কর্ম্মফল একসূত্রে গ্রথিত ও একীভূত হইয়া, কিরূপে সমগ্র মানব-জাতি-নিষ্ঠ জীবনের এক একটা স্তররূপে সংগঠিত হয়,—মানব-জাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহ শত বাধা প্রাপ্ত হইয়া, শত বার ইতস্ততঃ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ পাদ-বিক্ষেপে ক্রমে ঐরূপ গঠিত ঊর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করে, না কুমন্ত্রের কুৎসিত উদ্বোধনে অসার-গর্ভ কৃত্রিম স্তরে পাদক্ষেপ করিয়া, ক্রমে রসাতলের পথে অধঃপতিত হয়, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা তাহা যথাশক্তি আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতির সূত্র এবং আরোহ ও অবরোহ-নীতি।

যেখানে আধেয়, সেইখানেই আধার; যেখানে আধার, সেই খানেই আধেয়। আধেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই, উহার জন্য আধার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। আধার না থাকিলে, যেমন আধেয়ের অবস্থান অসম্ভব, তেমন আধেয় ব্যতিরেকেও, আধারের অস্তিত্ব অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ জগতে আধার বা ভিত্তি ভিন্ন কোন বস্তুরই অবস্থান সম্ভবপর নহে। আমরা পার্থিব স্তরের কথা বলিয়াছি,—মানবীয় উন্নতি-স্তরেরও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা, এই সকল স্তরের বিন্যাস, গঠন ও বিকাশ-বিষয়ে কিরূপ কার্য্যকারী, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পার্থিব স্তর ও মানবীয় উন্নতি-স্তর, দুই আধেয়। ইহাদিগের আধার কোথায়? ইহার একটিও পূর্ণাবয়ব পূর্ণ পদার্থ নহে;—উভয়ই দু'টি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বতন্ত্র পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব বা অঙ্গমাত্র। সেই পূর্ণ পদার্থ বা আধার কি?

পার্থিব স্তরের আধার,—পৃথিবীর বিপুল বপু। পার্থিব স্তর পৃথিবীরূপ পদার্থের অঙ্গ-সংলগ্ন উপাদান। কিন্তু মানবীয় মনঃ-শক্তি-সম্ভূত যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ক্রমোন্নতি বিধায়ক স্তর-নিচয়ের আধার বা দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? —উহাদিগের

ভিত্তি কি?—উহারা কোন্ পদার্থের অঙ্গ বা অঙ্গ-সংলগ্ন উপাদান? পার্থিব স্তরের ভিত্তি যেমন পৃথিবী, তেমন মানবীয় উন্নতি-স্তরের ভিত্তিও সমগ্র মানব-জাতি-নিষ্ঠ মনঃ-শক্তির সমবেত বিরাট্ সমষ্টি।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক মনুষ্যই আত্ম-নিষ্ঠ মনঃ-শক্তির উপাদান সমূহের যথাযুক্ত কর্ষণ বা উৎকর্ষ বিধান—অর্থাৎ প্রত্যেকেই আত্ম-গত মনঃ-শক্তির উদ্বোধন বা মন্ত্র-জাগরণরূপ সাধনা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু তাহার স্বল্পপরিসর নশ্বর-জীবন-ব্যাপি অভিজ্ঞতার ফল—তৎকৃত মানবীয় উন্নতির সেই সামান্য অনুষ্ঠানটুকুকে জীবন্ত রাখিয়া পরবর্ত্তী পুরুষদিগকে দেখাইয়া দিবার, অথবা মানবীয় উন্নতি সমষ্টির সর্ব্বত্রব্যাপক স্তরের সঙ্গে উহা গাঁথিয়া রাখিবার উপায় কি? স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তর-ফলক বা ইষ্টক-খণ্ড একটির অঙ্গে অন্যটি যোজিত হইয়া, অট্টালিকার এক একটি স্তরে পরিণত হয়। চূণ, সুরকি ইত্যাদি পদার্থই এই স্তরের গাঁথনী। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজ নিজ মন্ত্র-জাগরণরূপ সাধনা-বলে, স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যের অনুরূপ উন্নতির যে এক একটি ইষ্টক-খণ্ড বা প্রস্তর-ফলক প্রস্তুত করে, উহা মানবীয় উন্নতিরূপ অট্টালিকার অঙ্গে যুড়িয়া রাখিবার গাঁথনী, বা উপায় কি?—স্মৃতি। স্মৃতি-শক্তির আণবিক তন্তুর উপর নির্ভর করিয়াই, ব্যক্তিগত ও জাতি-নিষ্ঠ যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মঙ্গলা-প্রবাহ, যেমন সঞ্চয়-সময়ে উহার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুরূপ

সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তেমন ভবিষ্যতের দিকেও যুগে যুগে বাহিত হইতে থাকে।

চূণ, সুরকির গাঁথনী বিবিধ মসলা যোগে চিরস্থায়িনী হয়; এই গাঁথনীর একটি ইষ্টক-ফলক আর একটির সহিত যোজিত হইয়া চির তরে একীভূত হইয়া রহে। প্রবল ঝটিকাও সে গাঁথনীর বন্ধন সহজে ছিন্ন করিতে পারে না। ভূ-কম্পও তাহা সহজে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মসলার সংযোগ না ঘটিলে, প্রত্যেকেই স্বভাবে স্বতন্ত্র রহিয়া, কালে আপনি খসিয়া খসিয়া পড়িয়া যায়। স্মৃতির গাঁথনী সম্বন্ধেও সেই কথা। স্মৃতির গাঁথিনীতে ভাষাই সেই মসলা।

যখন ভাষার স্ফুরণ হয় নাই, তখন স্মৃতি প্রত্যেক মনুষ্যকে মাত্র তাহার জীবন-কালের জন্য সাহায্য করিয়া, তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাণীরূপিণী সরস্বতীর কৃপায়, মনুষ্যের রসনা হইতে ভাষার ভাগীরথী স্ফুরিত হইবার পরেই, স্মৃতি ধীরে ধীরে সমগ্র জাতিগত কল্যাণের পথ বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কালক্রমে শব্দগত-প্রাণ, বায়ু-ভূত-নিরাশ্রয়, নিরাকার ভাষা অক্ষরযোগে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লিখিত আকারে বিকশিত হইলে, স্মৃতির চরণে দৃঢ়-লৌহ-নিগড় সংযুক্ত ও উহার কার্য্যক্ষেত্র আরও স্থায়ী ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে স্মৃতির আর এক নাম হইয়াছে,—পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস। ইতিহাস অতীতের শরীর-বদ্ধ স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইতিহাস বলিয়া কথা কি? মানবীয় অভিজ্ঞতার সমস্ত ফলই, ভাষা-বিকাশের পর হইতে, স্মৃতির অধিকতর পরিস্ফুট ও দৃঢ়তর গাঁথনী বা বন্ধন-রজ্জুতে বর্ত্তমান ও অতীতকে এক শৃঙ্খলে বাঁধিয়া লইয়া, মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতেছে। স্মৃতি, বিবেক ও ভাষা ব্যতীত অভিজ্ঞতার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব লাভ অসম্ভব কথা। মানবীয় জাতীয় জীবনের উন্নতি-স্তর এই ভাষা কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত ও বিবেক কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই, উহার অন্তর্নিহিত আদিম উপাদান নিচয়ের সাহায্যে ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

ভূ-তাত্ত্বিকদিগের geology বা ভূবিদ্যা শাস্ত্র যেমন সমুদ্রের তলবর্ত্তী স্তরে অভ্রভেদী পর্ব্বত-চূড়া বা পাষাণ-কিরীটের ধ্বংস-রেণু, শ্যামল-শস্য-সম্পদের অক্ষয় আকর,—পলল-স্তরে মরুর কঙ্কর এবং হীরক-স্তরে শ্মশান-ভস্ম দেখিয়া এক একবার চমকিয়া উঠিয়াছে, এবং সবিস্ময়ে তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, পরীক্ষার অনন্ত প্রক্রিয়াযোগে, পৃথিবীর আদি-তত্ত্ব সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পঁহুছিবার নিমিত্ত প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছে, অতীতের শরীর-বদ্ধ স্মৃতি,—ইতিহাসও তেমনই, সময় সময়, মানবীয় সভ্যতা বা মানবীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ দর্শনে, বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে এবং সভ্যতার উচ্চতম দেব-সম্পদে সংবর্দ্ধিত উচ্চ মানব সমাজেও, বিজ্ঞানের সাহায্যে, মানসিক স্তরের তন্তু-বিচ্ছেদ

করিতে যাইয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে মানবজাতির সেই আদি শিশু নগ্ন-দেহ বন্য বর্ব্বরকে বারংবার স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পৃথিবীর যে স্থানে আজি শ্যাম-কলেবরা বন-ভূমি প্রফুল্ল-কুসুম-সুষমায় হাস্যময়ী, সেই, বন-ভূমিরই অভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকা-স্তরে, হয়ত কুম্ভীরের ব্যাদিত-বদন-কঙ্কাল বা কালসর্পের দংশন-ভঙ্গি-বিলসিত ভীষণ পঞ্জর লুক্কায়িত রহিয়াছে। এরূপ বিসদৃশ সংযোগ যেমন পার্থিব স্তরের নিত্য-প্রত্যক্ষ অবস্থা, তেমন মানবীয় জীবনেও এই শ্রেণীর বিসদৃশ সংযোগ নিত্য-প্রত্যক্ষ সামগ্রী। মানুষ জীবনের যে স্তরে আরোহণ করিয়া আজি প্রেমের নন্দন-কানন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, হয়ত সেই স্তরেরই অন্তর্দ্দেশে কোথাও হিংসা লুকাইয়া ফণা বিস্তার করিতেছে, কোথাও কাম তাহার ভুবন-মোহন কান্ত-কলেবর কুসুম-শয্যায় সজ্জিত করিয়া, বিনোদ-ভঙ্গিতে ফুল-ধনুর আকর্ষণে প্রেমের প্রাণে ভোগের তরঙ্গ তুলিতেছে। কোথাও বা লোভ বকাসুরের ন্যায় স্বর্গে ও মর্ত্তে ঠোঁট বিস্তার করিয়া, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাই গ্রাস করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। এই হেতুই শান্ত-রসাস্পদ দেব-পূজিত তপোবনস্থিত ঋষি-জীবনের উন্নততম স্তরে কখনও দুর্ব্বাসার ক্রোধ ধা করিয়া প্রলয়-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—কখনও বিশ্বামিত্রের গর্ব্ব ও প্রভুত্ব বিকট অট্টহাস্যে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে এবং কখনও বা কপিলের নয়নানলে সগর-বংশ ভস্ম হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। এই হেতুই যুধিষ্ঠির,

মানবীয় চারিত্র সম্পদের সেই উচ্চতম মঞ্চে আরূঢ় হইয়াও,—যখন একদিকে ভীষ্ম, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ, শিখণ্ডি হেন নির্জীব পদার্থের ক্ষীণ আঘাতে, অম্লান বদনে শর-শয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছিলেন ও সত্যের অনুরোধে অন্যদিকে অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথ বধে অসমর্থ হইয়া, জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে আপনার অদ্বিতীয় বীর-প্রাণটিকে অনায়াসে আহুতি দিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন,—সেই সময়েই, অবস্থা-চক্রে, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই হেতুই, দেব-সিংহাসনারূঢ় ইন্দ্রের প্রতি অহল্যা-পরিবাদে গৌতমের অভিসম্পাত হইয়াছিল; এবং ঈদৃশ অবস্থার বশেই দেব-বংশে শনির উদ্ভব, ও দানবকুলে প্রহ্লাদের উৎপত্তি। বস্তুতঃ জীবনের যে কোন স্তরেই তন্তুচ্ছেদ করিয়া দেখ না কেন, দেখিবে, যেখানে পশুত্ব বা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপাদান বেশী, সেখানেও স্থানে স্থানে উচ্চতর বৃত্তি, মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের সৌরভ পরিস্ফুট, আবার যেখানে দেবত্ব প্রবল, সেখানেও স্থানে স্থানে দেবত্ব বা উচ্চ বৃত্তির আবরণে পাশব প্রবৃত্তির হল-হলা। দেবতার স্তরে দানবের কঙ্কাল,—দানবের স্তরে দেবতার অস্থি। পার্থিব স্তরস্থিত বিসদৃশ সংযোগ যেমন ঐ সকল স্থানের অবস্থা একদিন কিরূপ ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করে, মানবীয় জীবন-স্তরেও এই বিসদৃশ বিষয়ের একত্র সমাবেশে, মানুষ একদিন কি ছিল, তাহাই যেন ভঙ্গিক্রমে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহে। স্মৃতিই এই কর্ম্মের আশ্রয়,—স্মৃতিই এই অবস্থার মুখ্য অবলম্বন। স্মৃতি এইরূপে মানবীয়

উৎকর্ষ বিধানও উন্নতি-স্তরের ক্রমিক বিকাশে প্রচুর সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

মানুষ এই উপায়ে, নিত্য জীবনের স্তর-বিশ্লেষ দ্বারা, সে একদিন কি ছিল, তাহা স্মরণ করুক। স্মরণ করিয়া, এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ভাল মন্দ বুঝিয়া লইয়া, মানব আপন আপন স্তরের অধিকতর বিশুদ্ধি-সম্পাদনে প্রয়াসপর হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যাহা বাঞ্ছনীয়, জগতের কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায়-তাহাই যে সম্ভবপর, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব, এইরূপ জীবন-স্তরের অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা স্মৃতির পটে অতীতের চিত্র দেখিয়া, অতীতের জন্য অশ্রু-সিক্ত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আতঙ্কিত হইবে—না অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া, ভবিষ্যতের-জন্য আশায় বুক বাঁধিবে এবং আশায় বুক বাঁধিয়া স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যভেদে, কখন উৎসাহিত, কখন বা গতিপথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মণ্য-পদ-প্রয়াসী বিশ্বামিত্রের ন্যায়, আত্মগত মন্ত্র-জাগরণরূপ কঠোর সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতির স্তর-গঠনকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবে, না ভবিষ্যতের ললাটে অবনতির কালিমা-লাঞ্ছন নিরীক্ষণ করিয়া, নিরাশ হৃদয়ে স্রোতে গা ভাসাইয়া নিয়তির টানে অধঃপাতের দিকে গড়াইয়া পড়িবে? এই সকলের কোন্‌টি তাহার পক্ষে সমীচীন, ইহাই বিচার্য্য।

বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম—এবং অঙ্কুর হইতে তরুর উৎপত্তি। তরু দিনে দিনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বা উন্নত হইয়া

প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, এবং ফুলে ও ফলে সুশোভিত হইয়া তরু-জীবনের চরম উৎকর্ষে যাইয়া পঁহুচে। একবার উন্নতি বা উৎকর্ষের চরম সীমায় পঁহুচিলে, আর কথা নাই, অমনি কালের মুখে উহার সম্পর্কে ক্ষয় বা লয়ের শিঙ্গা বাজিয়া উঠে। তরুটি ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, পলিত, গলিত, অন্তঃ-সার-শূন্য ও শুষ্ক হইয়া ঢলিয়া পড়ে। জাগতিক যাবতীয় পদার্থেরই এই ইতিহাস। সৃষ্টির সকল বস্তুর প্রতি যাহা প্রযুজ্য, মানুষের সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য হইবে না কেন?

মানুষের চরম উৎকর্ষ বা উন্নতি কি, মানুষ সেই চরম উন্নতির অবস্থায় দেব-সম্পদ্ ভোগ করিয়া, এক্ষণ অবনতির পথে অবতরণ করিয়াছে,—না, ঐ তরুটির ন্যায় এখনও বিকাশের পথে রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা অসম্ভব। যুক্তি, অনুমান, বা কল্পনা-বলে তাহা সম্যক্ বুঝিয়া লইবারও উপায় নাই। তবে একথা ঠিক্ যে, তরু নিজে কালের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িলেও, যে বীজ হইতে উহার উৎপত্তি, তাদৃশ অসংখ্য বীজ রাখিয়া চলিয়া যায়। সেই সকল বীজ হইতে আবার ঐ তরুটিরই অনুরূপ কোটি কোটি তরু ফুটিয়া, মোটের উপর তরু-জীবনের অধিকতর বিকাশ বা উন্নতির অধিকতর পরিস্ফুট স্তরেরই প্রকার প্রদর্শন করিয়া থাকে।

মানুষের সম্বন্ধেও এই অবস্থা সম্ভবপর নয় কি? এক খৃষ্ট ক্রুশ-কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার খৃষ্টত্বটুকু শত শিষ্য ও উপশিষ্যের যোগে পৃথিবী ছড়াইয়া পড়ে। একজাতি শ্মশান-

অনলে ভস্মীভূত হয়, উহার চিতা-ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, আর সহস্র জাতি ঐ ভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষের পক্ষে ইহা কি নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অসমীচীন কল্পনা? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

মানব-জগৎ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর—না, অবনতির দিকে অবনমিত, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। ক্রমিক উন্নতির নাম আরোহ ও ক্রমিক অবনতির নাম অবরোহ-নীতি। এই বিশ্ব-সংসার আরোহ না অবরোহ নীতি দ্বারা নিয়মিত, তাত্ত্বিকগণ এই তত্ত্বে বহু আলোচনা ও বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক অবরোহ-নীতির সত্যতা সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, জগতে যদি অতি প্রথমে প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি-গণের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই রক্ষা পাইতে পারিত না। এই বলিয়া, তাঁহারা অতি পূর্ব্বকালে দিক্-পালের ন্যায় যে সকল মহাপুরুষ জন্মধারণ করিয়া, সংসারের বহু গুরুতর অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। অবরোহ-নৈতিকদিগের কথা এই যে, উল্লিখিত মহাপুরুষেরা যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপরবর্ত্তী সময়ে পৃথিবী ঐ শ্রেণীর লোক-প্রসবে নিরন্তরই অক্ষমতা দেখাইয়া আসিতেছেন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্টদেব; বাল্মীকি ও ব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, ভীম ও অর্জ্জুন এবং আলেক্-জেণ্ডার, সীজার, ওয়াশিংটন্ ও বোনাপার্টি, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একবার বই দুইবার জন্মগ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ কি দৈহিক

বল-বীর্য্য, কি মানসিক প্রতিভা, সকল বিষয়েই মানুষের ক্রমশঃ অধঃপাত ঘটিতেছে।

যাঁহারা আরোহ-নীতির সত্যতা সম্বন্ধে আস্থাবান্, তাঁহাদিগের কথা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, বিশ্বসংসার ক্রমশঃ উন্নতির পথে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতেছে। জ্ঞানের আলোক পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে নিরুদ্ধ না রহিয়া, পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা বলেন,—তোমরা যে দিন দিন শারীরিক বল-বীর্য্যে হানি ঘটিতেছে বলিয়া প্রকৃতির ক্রমোন্নতি-বাদের অযথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নানা কথা বলিতেছ, ইহা নিতান্তই তোমাদিগের অসার প্রয়াস বা পণ্ডশ্রম। তোমাদিগের এই সকল উক্তির প্রতিকূলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সামঞ্জস্য বিধানই প্রকৃতির চির-সিদ্ধ স্বভাব; সামঞ্জস্য স্থাপনই তাহার কর্ম্ম। অতি প্রাচীন সময়ে, আদিম মনুষ্য জাতিকে, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বাস এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বিবিধ হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র থাকিয়া বনচরের জীবন যাপন করিতে হইত। কোন আশ্রয়-স্থান ছিল না, তাহারা প্রখর রৌদ্রের অনল-ক্রোড়ে অবস্থান করিত, শ্রাবণের ধারা মাথা পাতিয়া লইত এবং হিমানীর হিমে উৎপীড়িত হইত। উদরে ক্ষুধা ছিল, গোলায় তণ্ডুল থাকা দূরে থাকুক, ক্ষেত্রেও কৃষির সঙ্গে তখন কোন পরিচয় ছিল না। সুতরাং তাহারা বন-সহচর ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় হীনতরশক্তি পশুগুলিকে আক্রমণ ও হনন করিয়া উহাদিগের অপক্ক মাংসে

উদর পূর্ণ করিত। প্রকৃতি-প্রদত্ত মৌলিক অভাবগুলি যেমন আমাদিগের আছে, তাহাদিগেরও উহা তেমনই ছিল। কিন্তু আমরা এক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিপক্ক ও মার্জ্জিত উপায় ও ও কৌশলে, অনায়াসে সেই সকল অভাব মোচন করিয়া লই-তেছি। তাহাদিগের তহবিলে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক কণিকাও সঞ্চিত ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অভাব মোচনার্থই ভয়ঙ্কর কষ্ট স্বীকার, সহিষ্ণুতা অবলম্বন ও অপরিসীম বলবী-র্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলা প্রকৃতিও কাজে কাজেই তাহাদিগের দেহে কষ্ট-সহিষ্ণুতার অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভূত বলবী-র্য্যের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই হেতুই তাহারা শারীরিক বলবীর্য্য ও কষ্টস-হিষ্ণুতায় আধুনিক মানব অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভাণ্ডার বর্ত্তমান থাকা দূরের কথা, আজ বিজ্ঞান তাহার ঐন্দ্রজালিক করে যে সকল অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ব্যাপার সংঘটন করিয়া, পৃথিবীর এই জ্ঞানা-লোকজ্জ্বল চক্ষেও তাক লাগাইয়া দিতেছে, পূর্ব্বে ইহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতই, এখন মানব-জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-প্রসাদে, আদিম মানব-সুলভ বল-বীর্য্যের তাদৃক্ প্রয়োজনীয়তা নাই ; সুতরাং এক্ষণ প্রায় কোথাও আর তেমন বল-বীর্য্যের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না।

নিত্য-প্রত্যক্ষ জড়ীয় দেহ-পঞ্জর মানুষ নহে। সেই দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—আত্মা বা মনঃ-শক্তিই মানুষ। আত্মা বা

মনঃ-শক্তির বিকাশ ও উন্নতিতেই মানুষের প্রকৃত উন্নতি। আদিম মানব বল-বীর্য্যে পর্ব্বতোপম হইলেও, জ্ঞান-বৈভবে এখনকার মানুষের তুলনায় পঙ্গুসদৃশ ছিল। এখানকার মানব আবার বল-বীর্য্যে আদিম মানবের তুলনায় নগণ্য হইলেও, জ্ঞান-বৈভবে তাহার সহস্র-যুগব্যাপী শিক্ষাদাতা গুরু-স্থানীয়। আধুনিক বিজ্ঞানই সে জ্ঞান-বৈভবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই সকল যুক্তির অবতারণা দ্বারা আরোহ-নৈতিকগণ, বিশ্ব-সংসার ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, এই চিরপোষিত আত্ম-মতের সমর্থন করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মতে এই উভয়বিধ তত্ত্বের সহিতই সত্যের আংশিক সম্পর্ক আছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিলে, হয়ত অবরোহ-নীতিবাদের সত্যতাই অধিকতর স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতির একীভূত সমষ্টি ধরিয়া চিন্তা করিলে, বোধ হয়, ক্রমোন্নতি-বাদে নিশ্চিতই নিঃসন্দেহ হইতে পারা যাইবে। পূর্ব্বকালে যেমন অনন্যযুগসাধারণ মনীষিগণ জন্মধারণ করিয়াছেন, তেমন বর্ত্তমান যুগে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়াতে, পূর্ব্বকালের ন্যায় অল্পপরিসর সঙ্কীর্ণস্থানে সীমাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত মনীষা পরিলক্ষিত না হইলেও, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মনীষার প্রতিভা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তখন এক এক সময়ে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন, অজ্ঞানান্ধতা হেতু অন্য সকলেই অর্দ্ধ-অসভ্যরূপে পরিগণিত হইত

এবং তাহারা সকলেই, যাঁহাদিগের হাতে মনীষার মশাল, অন্ধের ন্যায় তাঁহাদিগেরই অনুসরণ করিত। এই কারণে, আরোহ ও অবরোহ-বাদ, এই উভয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ পরিমাণ সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায়, যে অবস্থা ব্যক্তিবিশেষকে বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতিকেই ব্যাপকভাবে স্পর্শ করে, যাহা মানবজাতিরূপ বিরাট্ বিগ্রহকে ক্রমে ফুটাইয়া তোলে, সর্ব্বসাধারণের জন্য উর্দ্ধারোহণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, উহাই জগদেক-প্রাণ মঙ্গলময়ের নিত্য অনুমোদিত মঙ্গল-নীতি; এবং এই নীতি দ্বারাই বিশ্বের গতি চির-নিয়ন্ত্রিত। এ নীতি কখনও, অবরোহ-নীতির সঙ্কীর্ণ আখ্যায়িকায়, ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ ক্ষুদ্র উন্নতির স্মৃতি বুকে লইয়া, বিষণ্ণবদনে ও নিরাশ হৃদয়ে অবরোহবাদীর অন্ধতম কূপে ডুবিয়া থাকিবার বস্তু নহে। উহা সর্ব্বাংশেই আরোহ-নীতির চির-আশাপ্রদ আনন্দময় নামে অভিহিত হইয়া, জগৎ জুড়িয়া পূজা পাইবার যোগ্য। একের তুলনায় যেমন দু'য়ের, তেমন দশের তুলনায় সমগ্র জাতির, এবং একটা সমগ্র জাতির তুলনায় সমগ্র পৃথিবীস্থিত মানব-সমষ্টির স্বার্থ বা উন্নতি অধিকতর দ্রষ্টব্য। যে নীতি-বলে, দশজনের অসাধারণ উন্নতির পরিবর্ত্তে, সর্ব্বসাধারণের সাধারণ উন্নতি বিহিত হয়, তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয় এবং উহাই যথার্থ উন্নতির স্বাভাবিক লক্ষণে অলঙ্কৃত। অতএব জগতের এই বিকাশ-নীতিকে অবরোহ-নীতি না বলিয়া, আরোহ-নীতি বলাই অধিকতর সমীচীন। সূক্ষ্মভাবে

চিন্তা করিয়া দেখিলে,—পৃথিবীবাসী সমগ্র মানবরূপী জীবকে এক-বিগ্রহরূপে দাঁড় করাইয়া, উহার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস পাঠ করিলে, ভগবানের জগৎ-যন্ত্রে, আরোহ-নীতিই যে নিত্য-ক্রিয়মাণা, চিন্তাশীলের মানস-নয়নে, বোধ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জীবনের স্তর ত্রিতয়।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ মানুষের সগুণ আত্মার তিনটি গুণ বা অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। সেই তিনটি গুণ বা অবস্থার নাম—"সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ"। সত্ত্বগুণ-প্রধান আত্মা শ্রেষ্ঠতম, রজোগুণ-প্রধান আত্মা মধ্যম এবং তমো-গুণান্বিত আত্মা নিকৃষ্ট। তাঁহাদিগের মতে সাত্ত্বিক প্রাণেও, সময় ও অবস্থাবিশেষ, রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্য ঘটিয়া, উহাকে অধোদেশে টানিয়া লইতে পারে; আবার রাজসিক বা তামসিক প্রাণেও সত্ত্বের সাময়িক বিকাশ-হেতু তাহাকে অধঃপাতের পথ হইতে টানিয়া আনিয়া অনেক দূর ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইতে সমর্থ হয়। যাহা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যক্তিগত ভাব, তাহাই সমষ্টিরূপে জাতীয় সম্পদ্। ব্যক্তিবিশেষ

যেমন, ব্যক্তিগতভাবে সত্ত্বঃ, রজঃ বা তমোগুণ-প্রধান হইতে পারে, তেমন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষও আবার সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়। সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষি, তাপস, যোগী ও ভক্ত সম্প্রদায়, সংসার-বিরাগী সাত্ত্বিক। সত্ত্ব ও রজোগুণের মিশ্রণে ক্ষত্র-ধর্ম্মী কর্ম্মী-সমাজ, সাংসারিক; একমাত্র রজোগুণের প্রাবল্যে দৈত্য ও দানবশ্রেণী, রাজসিক এবং তমোগুণান্বিত নির্দ্দয় ও নিকৃষ্ট রাক্ষস বা পিশাচ সমূহ তামসিক।

পাশ্চাত্য জগতের ঋষি-কল্প মনীষিগণ যদিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামে মানবাত্মার কোনরূপ গুণ-বিভাগ করেন নাই, তথাপি এ বিষয়ে প্রকারান্তরে তাঁহারা কিছু না বলিয়াছেন, এমনও নহে। তাঁহারা মানবাত্মার এই গুণত্রয়কেই Higher self এবং Lower self এই দুই নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে Higher self কে প্রবরাত্মা এবং Lower self কে অবরাত্মা নামে নির্দ্দেশ করিলাম। *

আমরা, এই পরিচ্ছেদে মানবীয় ক্রমোন্নতি-ঘটিত যে তিনটি স্তরের বিষয় বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি, সেই স্তরত্রয় দ্বারা ভারতীয় ঋষি-নির্দ্দিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অথবা পাশ্চাত্য

* অদ্বিতীয় শাব্দিক পণ্ডিত চির-শ্রদ্ধেয় বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয় Higher self এবং Lower self শব্দের যে বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এই স্থানে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

পণ্ডিতের Higher self ও Lower self প্রবরাত্মা ও অবরাত্মা নামে পরিচিত শুধু মানবাত্মার গুণ গ্রাম বা শক্তিকেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। সেই গুণ বা শক্তি ও তদুৎপন্ন কার্য্য-ফল, এই উভয়ই সমবেতভাবে, আমাদিগের এই গ্রন্থে ক্রমোন্নতির স্তররূপে নির্দ্ধারিত হইল। আমরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই অপ্রচলিত সংস্কৃত-গন্ধি পুরাতন নাম ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, ভাগ্য-বিপর্যয়ে, এক্ষণ পুরাতন কালের নিত্য-পরিচিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অপেক্ষাও বিদেশী Higher self ও Lower self অধিকতর হৃদ্য ও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং Higher self ও Lower self নামেই আমরা আমাদিগের কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম বা নিম্ন স্তরে Lower self বা অবরাত্মার প্রাবল্য অবস্থা,—নিকৃষ্ট ভাব। দ্বিতীয় স্তরে Higher self ও Lower self,—প্রবর ও অবরাত্মার সাময়িক প্রাবল্য হেতু সাম্য অবস্থা বা সমভাব। তৃতীয় বা উন্নততর স্তরে একমাত্র Higher self বা প্রবরাত্মার প্রাবল্য হেতু উচ্চতম ভাব; অর্থাৎ পুরাতন সংজ্ঞানুসারে এই তিনটি জীবনের তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক স্তর। এই প্রবরাত্মার উপরেও আবার অবশ্য একটি স্তর আছে। মানবের প্রাণে যখন আত্মার জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তখনই সে এই স্তরে আরোহণ করে; এই স্তরে আরূঢ় হইলে, তাহার আর পার্থিব কোন পদার্থে বিন্দুমাত্রও আসক্তি বা অনুরাগ থাকে না। তখন তাহার

ঊর্দ্ধ-উন্মুখ প্রাণ পরানন্দময় অমৃতে মগ্ন হইবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠে; এবং ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মে লীন হইয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত নিরন্তর সমুৎসুক রহে। ইহা হিন্দুর হিসাবে সাত্ত্বিকত্ব নহে; সাত্ত্বিকেরও ঊর্দ্ধস্থ স্তর দেবত্ব; পাশ্চাত্যের চক্ষেও ইহা Higher self এর ঊর্দ্ধস্থ সোপান—Angel বা দেবাত্মার ক্রীড়া-ভূমি।

স্তর-ত্রিতয়ের বিশদ পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে মানবজাতির মানসিক উপাদান এবং ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতিতে ঐ সকল মানসিক উপাদানের ক্রমিক উদ্বোধন ও কর্ম্ম-প্রক্রিয়ার পর্য্যায় নির্দ্দেশ একান্ত আবশ্যক।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ-নামা দার্শনিক হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন যে, শিশুর কার্য্য-কলাপে নৈতিক উৎকর্ষ আশা করা যায় না। সভ্য-জগতের দীন-সত্ত্ব অজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানালোক-উজ্জ্বল মুকুট-মণি পর্য্যন্ত, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক ব্যক্তিই, শৈশব অবস্থায় যে আদিম অসভ্য বর্ব্বর জাতি হইতে মানবের উৎপত্তি, সেই বর্ব্বরোচিত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। চেটাল নাসিকা, স্থূল ওষ্ঠ, বিস্ফারিত নেত্র, নাসা-রন্ধ্রের প্রসারিত বহির্ভাগ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে কিছুদিনের তরে যেমন শিশুদিগের সহিত আদিম অসভ্য লোকের তত্তৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, প্রকৃতি-প্রদত্ত বুদ্ধির প্ররোহেও তেমনই একটু সাদৃশ্য থাকে। মানব-জাতির শৈশব অবস্থা ও প্রতি মানবের শৈশব অবস্থায়

এই যে একটা বিচিত্র সাম্য বা সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহার অর্থ কি ?

ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য-শিশু তাহার অবিকশিত দেহ এবং অস্ফুট বুদ্ধি ও অপরিপক্ক জ্ঞান লইয়া জীবনের যে নিম্নতম স্তরে কিছুকালের জন্য অবস্থিত থাকে, আদিম অসভ্য বর্ব্বর,—মানবজাতির সেই আদি শিশুও—দেহ, মন এবং বুদ্ধির বিকাশ সম্পর্কে প্রায় সেই গ্রামে বা সেই নিম্নতম স্তরেই অবস্থিত ছিল। এই কারণে, এই সাদৃশ্য। কিন্তু এক্ষণকার শিশু-জীবন উন্নত-স্তরস্থিত বিকশিত মানব-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধনে নিত্য অনুস্যূত; সুতরাং অচিরেই তাহার চক্ষু ফুটিয়া উঠে;—তাহার অজ্ঞানান্ধ বর্ব্বর অবস্থা, ক্ষণস্থায়ি কুজ্ঝটিকার ন্যায়, অন্তরালোকের বিকাশে অচিরেই অপসারিত হইয়া যায়। শিশুর শৈশব-স্বভাবোচিত Egoism বা আত্মবাদও পরকীয় স্নেহের আদর ও আবদারে নিত্য আপ্যায়িত হইয়া, এবং এইরূপে পরার্থা প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, উহার নিকট মস্তক অবনত করিতে শিখিয়া লয়। কিন্তু আদিম মানবের পক্ষে শিক্ষার দ্বার এই ভাবে উন্মুক্ত ছিল না বলিয়াই, তাহার বর্ব্বরতা দীর্ঘস্থায়িনী হইয়া, তাহার তদানীন্তন অসভ্য চরিতের চিহ্ন বা উপলক্ষণ স্বরূপ আজীবন বর্ত্তমান থাকিত।

মানবীয় জীবনের এই নিম্নতম স্তরে Lower self বা অবরাত্মারই অদ্বিতীয় আধিপত্য। এই অবস্থায়, মানবের আত্মবাদ বা Egoism-মূলক স্বার্থচিন্তাই, হৃদয়, মন ও প্রাণকে

একবারে গ্রাস করিয়া রহে। তখন পাশব-স্বার্থই একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হইয়া পড়ে। বিবেক প্রসুপ্ত; সুযুক্তির সূত্র এলোমেলো। বিবেক ও সুযুক্তির তাড়না, তখন তাহার শুধুই আত্ম-সুখ-সাধন-প্রয়াসি চিত্তকে, স্বসুখের জন্য প্রয়োজনীয় নিতান্ত জঘন্য কর্ম্ম হইতেও ফিরাইতে সমর্থ হয় না। আমি খাইব, আমি ভোগ করিব,—আমার যাহাতে তৃপ্তিসাধন হয়, তাহাই করিব; তখন তাহার এই একই ভাব ও একই কথা। পশু যেমন ক্ষুধিত হইলে, এইমাত্র যে পশু-পত্নীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লেহন করিয়া, পাশব প্রেম ও আদরের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল, তাহাকেই করাল দংষ্ট্রা প্রদর্শনে ভয় দেখাইয়া, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়,—পক্ষী যেমন পক্ষিণীকে তাড়না করিয়া, তাহার চঞ্চুপুট হইতে ভয়-স্খলিত ধান্য-কণা আপনি উদরসাৎ করিয়া আনন্দে উড়িয়া যায়;—মানুষ যখন জীবনের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত,—সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অবরাত্মার অধীন,—তখন তাহার আত্মবাদ ও স্বার্থ-নিষ্ঠতাও প্রায় এই শ্রেণীরই হইয়া থাকে। পরের জন্য তাহার মনে একটুকুও চিন্তা হয় না। সৎকার্য্যে অথবা কোন প্রকারে কোনরূপ আত্মত্যাগে সে যদি তখন বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয়, আপনার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বাধীন প্রবৃত্তি-বশে হয় না;—যদি কখনও সে ঈদৃশ অনুষ্ঠান করে, তবে তাহা কেবল ভয়ের তাড়নায়, অর্থাৎ আপনাকে বাঁচাইবার জন্যই করে; স্বার্থের জন্যই স্বার্থত্যাগের ক্ষণিক অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়।

বিষয়টি আরও একটু পরিস্ফুটরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 'শিশু নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ,' এই কথাটি জন-সমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত। হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আছে, পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, শিশু তৎকৃত অপরাধ বা পাপের জন্য জনসমাজেও দায়ী নহে,—পুরলোকেও তজ্জন্য ফলভোগী নহে। শিশু সম্বন্ধে খৃষ্টদেবের উক্তি অধিকতর উচ্চ ও উদার। তিনি বলিয়াছেন,—"যদি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে চাও, তাহা হইলে ঐ শিশুর মত হও।" এই সকল উক্তি, যুক্তি ও ব্যবস্থার এমন অর্থ নয় যে, শিশুর অন্যায় বা অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, বা তাদৃশ কর্ম্ম শিশু কর্ত্তৃক কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। শিশুরা অনেক সময়, স্বভাবের বশেই ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া বসে ;—মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, রাগান্ধ হইয়া একে অন্যের উপর উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। শিশু এসকল করিলেও, ঐ সকল উক্তি অর্থশূন্য নহে। ঐ সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শিশু দুষ্কার্য্যের জন্যই দুষ্কার্য্য করে না। তাহার ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ জ্ঞান নাই। তাহার বিবেক ফোটে নাই, ভাল মন্দের পার্থক্য বোধ বা বিষয়-জগতের কোন তত্ত্বেই অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে যাহা করে, সরল প্রাণে শিশু-প্রবৃত্তির সাধারণ উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া করে। সে কাল-ফণীর ফণা-বিস্তার দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল প্রাণে উহার সন্নিহিত হয়; এবং বিষ-দংশনে ঢলিয়া পড়ে। জ্বলন্ত অনলে রূপের চমক দেখিয়া, আনন্দভরে উহাকে ধরিতে যায়, এবং আগুনে আঙ্গুল

পোড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করে। শিশুর এই সমস্ত অনুষ্ঠানই অজ্ঞতামূলক এবং ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিতই উহার প্রাণ-নিহিত মধুর সারল্যের সম্পর্ক। এই সারল্যের গুণে মুগ্ধ হইয়াই খৃষ্টদেব শিশুর জন্য স্বর্গদ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। এই সারল্য হেতুই, হিন্দু-পুরাণোক্ত মাণ্ডব্যের বরে শিশু সমস্ত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে; এবং এই সারল্যের অনুরোধেই জন-সমাজ শিশুকে 'নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শিশু কর্ত্তৃক বহু মন্দ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ধাত্রী-গৃহে বসিয়া কিছুকাল শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, এই উক্তির সমর্থনার্থ বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। শিশুগণ যদি শাসনের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষাও একে অন্যের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হয়। শৈশব-সময়ে স্বেচ্ছামত চলিতে পারিলে, শিশু কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরতার একশেষ প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু শিশু-প্রাণের এই বন্যভাবাপন্ন আদিম অবস্থা শৈশবের সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়। শিশু মানুষরূপে ফুটিতে ফুটিতেই জীবনের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার পক্ষে এই পথ স্বভাব-প্রদর্শিত পথের ন্যায় সরল ও সুগম। এক দিকে জন্মমাত্রই মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রণালী শিশুর শিক্ষা-কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিযুক্ত হয়; অন্যদিকে যাহাদিগের ক্রোড়ে

শিশুর অবস্থান, তাহাদিগের নিত্য-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত তাহার মনের উপর প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতে থাকে।

আদিম মানবের পক্ষে একথা নহে। মানবজাতি, সেই আদিম শৈশব অবস্থায়, পূর্ব্ব-সঞ্চিত সভ্যতার কর-রেখা-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাদিগের প্রতিপদে কাঁটা ফুটিয়াছে,—তাহাকে পদে পদে ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া লইতে হইয়াছে। সুতরাং অতি ধীরে কেবল স্বভাবের সহায়তায়, তাহারা যুগযুগান্তের পরখ ও পরীক্ষার পরে, অতি মন্থর গতিতে সভ্যতার স্তরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে। তাহারা পুরুষ-পরম্পরায় বর্ত্তমান সভ্যতার স্রষ্টা। তাহারা বহু সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা জীবনের এক একটা স্তর গঠন করিয়াছে, এবং তাহার পরে অতি সাবধানে পাদক্ষেপ করিয়া, দুই পদ অগ্রসর ও একপদ পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া, অনেক আয়াসের পরে, সেই স্তরে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছে। অনন্তকাল হইতে এই প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতেই বর্ত্তমান সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের-মানব শিশুকে এই শ্রেণীর আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। তাহারা সভ্যতার উচ্চতর গ্রামে জন্মধারণ করিয়া মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে,—উত্তরাধিকার-সূত্রেই যেন পূর্ব্বসঞ্চিত সম্পদের অধিকারী হইয়া বসে। তাহাদিগের জীবন-ব্যাপারে নূতন স্তর গড়াইয়া লইতে হয় না, তাহারা পূর্ব্ব-গঠিত স্তরের সংস্কার দ্বারাই অনেক সময় উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এ অংশে সত্যযুগের মানব-নিকর অবশ্যই

ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবজাতির আদি শিশু কিরূপে, কীদৃশ মানসিক উপাদানের বিকাশে, মানুষ হইবার সর্ব্বপ্রথম পথ প্রাপ্ত হইল, আমরা এক্ষণ তৎসম্পর্কেই একটু আলোচনা করিব।

প্রত্যেক আদিম মনুষ্য বা বর্ব্বর ব্যষ্টিভাবে আজীবন শিশু-ভাবাপন্ন রহিলেও, সে মানব-শিশু,—বিকশিত ও বিকাশমান মানব-সমাজের অবিকশিত আদিজনক। সে বংশ-পরম্পরায় স্মৃতির ক্ষীণ সূত্রে সূত্রিত রহিয়া, সমষ্টিতে ক্রমে ফুটিয়াছে; এবং স্তরের পর স্তরে ক্রমে উন্নতির পথে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া, বন্য বর্ব্বরতা বা পশুত্ব একবারে ধুইয়া পুছিয়া ফেলিয়া দিতে না পারিয়া থাকিলেও, আবরণের উপরে আবরণে উহা ঢাকিয়া লইয়া, সুসভ্য মানবের সুমার্জ্জিত বিনোদ-বেশে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইক্ষণকার শিশুদিগের ন্যায় এই পরিবর্ত্তন, কতিপয় বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই,—ক্রম-বিকাশ-নীতির যুগ-যুগান্ত-ব্যাপিনী প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে হইয়াছে।

যুগযুগান্ত-ব্যাপিনী কিরূপ বিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানবজাতির আদি শিশু মনুষ্যত্বে বিলসিত হইতে সমর্থ হইয়াছে, ইতিহাসের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘটনা দ্বারা তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা দূর অতীতের চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত কথা। বাস্তু-গৃহের সান্নিধ্যে নিত্য-প্রত্যক্ষ যে ক্ষুদ্র তরু বা ক্ষীণ লতাটি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে বিকশিত হইতেছে;—উহারও বিকাশগত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ইতিহাস সঙ্কলন অসাধ্য। উহা পরশ্ব ভিত্তির নিম্নে ছিল,

কাল ভিত্তির সমান উচ্চতালাভ করিয়াছে, আজ প্রাচীরে হেলান দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে,—অহোরাত্র চক্ষু লাগাইয়া তাকাইয়া থাকিলেও, যেমন উহার এই সর্ব্বক্ষণব্যাপী বিকাশ বা বৃদ্ধির গতি দৃষ্টিগোচর হয় না, মানবীয় বিকাশের গতিও তেমন চক্ষু দিয়া তাকাইয়া থাকিয়া দেখিবার বস্তু নহে। উহারও ফল প্রত্যক্ষ, বিকাশ-প্রক্রিয়া, যুক্তি ও অনুমান দ্বারা বোধব্য;—ইহারও ফল প্রত্যক্ষ, বিকাশ চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনা দ্বারা অনুমেয়। মনোবিজ্ঞান মানবীয় বিকাশ-প্রক্রিয়ার তত্ত্বে যে সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছে, এস্থলে সেই বিজ্ঞান-সূত্র ধরিয়া, এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

ক্রম-বিকাশ-নীতিবলে, যে বীজ যে প্রকৃতির সেই বীজ হইতে সেই প্রকৃতির বস্তুই পরিস্ফুরিত ও বিকশিত হইয়া থাকে। মালতীর বীজে গোলাপ অথবা আমের আঠিতে জামের উৎপত্তি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। মানবজাতির আদি শিশু,—বনচারী বর্ব্বর পশুর সহিত বন্য-জীবন যাপন করিয়াও, কালে মানুষ রূপেই ফুটিয়াছে। কিন্তু কোন পশু মানুষের গৃহে সাদরে গৃহীত ও প্রতিপালিত হইয়াও এবং অষ্টপ্রহর মনুষ্য-সংসর্গে বাস করিয়াও, কোন কালে, মানুষ হইতে বা মানুষের প্রাণে বিকসিত হইতে পারে নাই। ইহা কেন?—না, মানুষ মনঃ-শক্তির যে বীজ বা অঙ্কুর লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, কোন পশু সে বীজ লইয়া জন্ম ধারণ

করে নাই। পশুর একমাত্র সম্পদ্—সংস্কার (instinct)। অসভ্য বর্ব্বর বা আদি মানব-শিশুর সম্বল শুধু সংস্কার নহে; সেই সংস্কার এবং সংস্কারের উপরে আরও একটু কিছু। সেইটুকু জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন অঙ্কুর ও হৃদয়-বৃত্তির অস্ফুট জ্যোৎস্না-প্ররোহ। এই দু'টি বস্তুর সদ্ভাবেই মানুষ মানুষ এবং এ দু'টির অসদ্ভাবেই পশু পশু। বর্ব্বর-ভাবাপন্ন মানুষে পাশব-সংস্কার প্রবল এবং জ্ঞান ও হৃদয়-বৃত্তি নিস্তেজ ছিল। ঐ দুইটি যত ফুটিয়াছে, সংস্কার-জনিত উত্তেজনা ততই সংযত ও প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, সংস্কার কি পদার্থ, অগ্রে তাহাই অবধারণ করা আবশ্যক। Instinct বা সংস্কার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধনামা জীব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কুভিয়ার (Cuvier) বলিয়াছেন,—পশ্বাদি ইতর জন্তুর মস্তিষ্কে কতকগুলি কল্পিত-মূর্ত্তি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; উহাদিগের কার্য্যাবলী ঐ স্বাভাবিক অনুভূতিদ্বারাই নিয়মিত হয়। এই সকল অনুভূতির প্রকার ও প্রকৃতি অনেকাংশেই স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণকারী (Somnumbulist) সুপ্ত; তাহার সেই বা স্বপ্নাক্রান্ত অবস্থায়, মানসিক বিকারবশে যে সকল কার্য্য করে, জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন তাহার কিছুই মনে রাখিতে পারে না, অথচ করিবার সময়, ভাল মন্দ, কালাকাল ও সুবিধা অসুবিধা বিচার করিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ রহে, তেমন এই সংস্কার-

পরিচালিত জীব-নিবহ যাহা করে, তাহা অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই করে।

কুভিয়ারের এই ব্যাখ্যাই যদি প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, বহির্জগতের জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বারা ইতর জন্তুদিগের কার্য্য একেবারেই নিয়ন্ত্রিত হয় না,—একটা অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই উহারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয় মাত্র। কিন্তু একটু বিশেষ প্রবিষ্টরূপে অনুসন্ধান করিলে, কুভিয়ারের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সমীচীনরূপে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইতর জন্তুগণ অন্তর্নিহিত শক্তির বশে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয় সত্য; কিন্তু তাহা হওয়া সত্ত্বেও, বাহ্য-জগতের অনুভূতি বা জ্ঞান উহাদিগের একবারে নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তীব্র শীতের সময় কুক্কুর, যেখানে ভস্ম বা শুষ্ক খড়ের স্তূপ থাকে, সেইখানে যাইয়া আরামে শয়ন করে। বিড়াল জল ভাল বাসে না। জলের ছিটা গায়ে লাগিলে বিড়াল বড় বিরক্ত হয়। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ঘটিলেই, সে যেখানে জল-বিন্দু তাহার গায়ে লাগিতে না পারে, এরূপ কোন স্থানে যাইয়া আশ্রয় লয়। বাহ্য জগতের কোনরূপ জ্ঞান বা অনুভূতি না থাকিলে, পশুর সংস্কারে এরূপ সতর্কতার ভাব কখনও পরিস্ফুরিত হইত না। পশ্বাদি ইতরজীবের কার্য্যকলাপ এবং নিদ্রিত ভ্রমণকারী বা স্বপ্নাভিভূতের কার্য্যাবলীতে যে একটা অতি বড় স্থূল পার্থক্য রহিয়াছে, কুভিয়ার তাহার প্রতিও একবারেই লক্ষ্য করেন নাই।

সে পার্থক্য এই,—স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, অথবা মানসিক বিকার বশতই হউক, মানুষ যখন যে কার্য্য করে, সেই কার্য্যের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এবং কোন একটি দূর উদ্দেশ্য সাধন অভিলাষেই যে তাহার আন্তরিক বৃত্তিগুলি কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইতর জীবের কার্য্যে কোন শৃঙ্খলা নাই, এবং কোন সুদূর উদ্দেশ্যের সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকে বলিয়াও অনুমিত হয় না।

আমরা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করি। এই সময়, সহস্র বিষয়ক সহস্র প্রকার চিন্তা আমাদিগের মনে বিচরণ করিতে থাকিলেও, বেশ-পরিবর্ত্তনই যে তখনকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পতঙ্গ-জননী অণ্ড প্রসব করে প্রকৃতির প্রবর্ত্তনায়; এবং সেই অণ্ড-সম্ভূত পতঙ্গ-শিশু যেখানে প্রচুর আহার্য্য পাইয়া সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, সেই স্থানই অণ্ড প্রসবের জন্য মনোনীত করিয়া লয়,—ইহাও সে স্বভাবের বশেই করে। কিন্তু কি জন্য, কেন সে অণ্ড প্রসব করে, তাহা সে জানে না; অণ্ড-সম্ভূত সন্তানের আহার্য্য-প্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ বিচার বিতর্ক করিয়াও সে স্থান মনোনীত করে না। অণ্ডের ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়েই সে চিন্তা-শূন্য ও অন্ধ। ইহাই সংস্কার বা instinct। ফলতঃ সংস্কার-পরিচালিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আপনা হইতেই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে উদ্দেশ্য অবধারণ, তৎপর মানসিক বিচার-

বলে তদুপযোগি কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ এবং অবশেষে সাধন-কল্পে প্রয়াস, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সংস্কারের বিরুদ্ধ-প্রকৃতি বা ভাব।

পাশব-সংস্কারের মত মানুষের মধ্যেও একটা জিনিষ আছে। কিন্তু উহা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পাশব-সংস্কার নহে। মানুষের সংস্কারও অভিজ্ঞতা দ্বারা নিত্য নিয়মিত। সুতরাং প্রথম হইতেই জ্ঞান ও বিবেক-বিচারের সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মানবীয় বৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই বিভাগ ত্রিতয়ের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীস্থ বৃত্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত ইতর প্রাণীতে পরিদৃশ্যমান সংস্কারের সাদৃশ্য আছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে মানবীয় এই শ্রেণীর প্রবৃত্তিগুলিকে instinct বলা হয় নাই,—propensions নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরাও এগুলিকে প্রাকৃতিক প্রাক্তন-প্রবৃত্তি নামে অভিহিত করিলাম।

এই শ্রেণীর প্রবৃত্তির উত্তেজনাকল্পে বহির্জ্জগতের প্রয়োজনীয়তা বড় বেসী নাই। অহর্নিহিত অভাব-অনুভূতিই এই শ্রেণীর প্রবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজক হেতু। এই প্রবৃত্তিগুলিও আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একটির কার্য্য—আহার ও বিহার অর্থাৎ পুং-স্ত্রী-সংযোগ ইত্যাদি। অন্যটির কার্য্য—জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা। প্রথমটির নাম—বুভুক্ষা appetite। বুভুক্ষা দ্বিবিধ—জঠরানল-সম্ভূত ও ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত। এই দ্বিবিধ বুভুক্ষা যেমন মানুষে আছে, তেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, এমন কি, যে শ্রেণীর জীবের জন্ম, শরীর ধারণ,

রক্ষণ ও পোষণ, এবং সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাহাতেই উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। জীব-পর্য্যায়ের নিম্নতম গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বোচ্চ গ্রাম পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই এই বুভুক্ষার appetite সত্তা বা কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ-জগৎ হইতে মানবজাতি পর্য্যন্ত সমস্তের ইতিহাসই এই বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যেখানে জাতিতে প্রবাহ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সেই খানেই এই শ্রেণীর বৃত্তিগুলির সত্তা ও স্ফূর্ত্তি অনিবার্য্য।

প্রাক্তন-প্রবৃত্তির দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জৈবিক-স্বভাব-প্রবণতা জীব-জগতের প্রাকৃত বা জন্ম-সম্পদ্। কিন্তু সমস্ত স্তরের জীবেই উহা সমপরিমাণে বর্ত্তমান থাকে না। কোন স্তরের জীবে বেসী, কোন স্তরে পরিমাণ ও মাত্রায় এই প্রবৃত্তি ক্ষীণতর। এই প্রবৃত্তির প্রধান ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালনা এবং ক্রমিক পরিচালনা হেতু ক্লান্ত ও শিথিলবীর্য্য হইয়া পড়িলে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশ্রাম ও অবসর প্রদান। জগতের সমস্ত চক্ষু আপনা হইতেই প্রতিনিয়ত দর্শনার্থ পরিচালিত হইতেছে, এবং ক্লান্তি বোধ হইলে, আপনা আপনি মুদিত হইয়া আসিতেছে। কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পর্কেই এই কথা। হস্ত পদাদির অবিশ্রান্ত সঞ্চলনই স্বভাব। পশু পক্ষী আহার অন্বেষণে অঙ্গচালনা করে; যখন এ প্রয়োজন না থাকে, তখনও পরস্পর মিলিয়া সেই এক প্রকার খেলার রঙ্গে শরীর চালনায় ব্যাপৃত রহে। গো-বৎসেরা যে উহাদিগের

জননীর কাছে কাছে থাকিয়া, পুচ্ছ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটাছুটি করে, তাহা বস্তুতই দেখিবার জিনিস। মানব-শিশুকে তিলার্দ্ধকালও নিস্পন্দভাবে শয্যায় শোয়াইয়া রাখা যায় না। তাহার হাত পা সর্ব্বদাই চলিতে থাকে। ব্যায়াম দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ ও পুষ্টিসাধন হয়; প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্য বুঝিয়া অথবা গুরুমহাশয় প্রদত্ত স্বকর্ণমর্দ্দন এই তত্ত্বের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া অপোগণ্ড শিশু ইহা করে না। স্বভাবের বশেই ইহা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আপনি নিদ্রা আসিয়া কোলে আবরিয়া লয়। নিদ্রাতেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়-গ্রামের বিশ্রাম। ইহাই জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা। তরু, লতাও এই প্রাকৃতিক শক্তিতে বঞ্চিত নহে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা, তরু লতাতেও চেষ্টা ও নিদ্রারূপ জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা বর্ত্তমান আছে, এই তথ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

মানবীয় আর এক শ্রেণীর বৃত্তির বিষয় বিবৃত হইতেছে। এই শ্রেণীর বৃত্তি আভ্যন্তরিক অভাব অনুভূতি হইতে উদ্বোধিত হয়। আভ্যন্তরিক ক্ষতিপূরণ, বা প্রয়োজন উদ্ধারার্থ কোন প্রকার বুভুক্ষার উত্তেজনা হইলে, যে বাহ্য বস্তু দ্বারা সেই ক্ষতির পূরণ বা তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন হইতে পারে, মন বুভুক্ষাবশে প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাম লইয়া উহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। সে কখনও রাক্ষসের মূর্ত্তিতে উহাকে গ্রাস করিতে যায়, কখনও বা বিলাসীর ভাবে উহাকে অধিকৃত রাখিয়া, উহার ক্ষণিক ভোগেই

তৃপ্তিলাভ করে। এই শ্রেণীর বৃত্তির উদ্বোধন আভ্যান্তরিক অভাবে;—আকর্ষণ বাহ্য বস্তুর প্রভাবে।

অপর এক শ্রেণীর বৃত্তি আছে, তাহারা নিদ্রিত অবস্থায় অন্তঃকরণে লীন হইয়া রহে। আভ্যান্তরিক সহস্র প্রকার অভাবে তাহাদিগের এ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বহির্জ্জগৎ-স্থিত পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে তাহাদিগের উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যাহা সুখকর ও প্রীতিজনক, কিংবা যাহা প্রয়োজনীয়, চিত্ত আভ্যান্তরিক উত্তেজনায় তাহার দিকে স্বতঃ পরতঃ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহা কষ্টদায়ক, অপ্রীতিকর, —যাহা ক্ষতিকর, অমঙ্গলজনক, কিংবা যাহা প্রয়োজনীয় নহে, —বরং পরিবর্জ্জনীয়, চিত্ত আপনি তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে এবং তাহা দূরে অপসারিত করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, কিংবা তাহা হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার জন্য, অধীর হইয়া উঠে। জীব যে সকল বৃত্তির বশে এই কার্য্য করে, সেই সকল উগ্র অপসারিকা-বৃত্তির একটি ঘৃণা, আর একটি ক্রোধ এবং তৃতীয়টি ভয়। অরুচিকর, অবজ্ঞাজনক বস্তু সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলে, মানবের মনে যে বৃত্তির উত্তেজনা হয়, তাহার নাম ঘৃণা (antipathy)। যে, বাহ্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘৃণার উৎপত্তি, চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় না, তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়,—যাহা দ্বারা কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত, আহত, বা বিড়ম্বিত হওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি মানবীয় মনের যে ভাব, উহার নাম ক্রোধ (anger)। ক্রোধের সহিতও অনুরাগাত্মক আকর্ষণের কোন

সম্পর্ক নাই। ক্রোধেরও ফল বিরাগ। ক্রোধও যাহার জন্য উহার উদ্বোধন, তৎপ্রতি হয়ত দূর হইতে আরক্ত-নয়নে দৃষ্টি-পাত করে, আর না হয়ত, সেই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব লোপের নিমিত্ত সংহার-মূর্ত্তিতে অগ্রসর হয়। যে ক্ষতি, অমঙ্গল বা বিপদ্ সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই যাহা উপস্থিত হইতে পারে, তাদৃশ ক্ষতি, অমঙ্গল, বা বিপদের কল্পনায় যে মানসিক ভাবের উদয় হয়, উহার নাম ভয় (fear)। যাহা হইতে ভয়ের উদ্ভব, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, "ত্রাহি মধুসূদন" রবে, তাহা হইতে সরিয়া পড়িতে পারিলেই মনের পূর্ণতৃপ্তি। ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয় এই তিনটি পরস্পর এমনই একটা বিচিত্র সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ যে, তাহার কোনটি প্রায়শঃ অপর দুটির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। ক্রোধ ঘৃণার অনুসরণ করে, ঘৃণাও ক্রোধের অনুবৃত্তি করিয়া কৃতার্থ হয়। ভয় হইতে ঘৃণার সঞ্চার কিরূপে হয়, সহজেই তাহা অনুমেয়। এক প্রকারের ক্রোধও অসহনীয় ভয়ের স্থলবর্ত্তী হইয়া প্রলয়-হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠে;—বিপদে পড়িয়া পশু পক্ষী কর্ত্তৃক আক্রমণ ও মানুষের মরিয়া হইয়া মারিতে যাওয়া, এদুই ভয়-জন্য ক্রোধের আকস্মিক বিকাশের ফল।

প্রথমোক্ত বৃত্তিটি—অর্থাৎ বুভুক্ষা প্রভৃতি শরীর-পোষণী বৃত্তি, উদ্ভিদাদিতেও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি উগ্র অপসারিকা বৃত্তিনিচয় উদ্ভিদাদিতে আছে বলিয়া

অনুমিত হয় না। উহা জীব-জগতের সম্বল। পরস্পর প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ প্রকৃতিক পদার্থ ও ধ্বংস-সাধনী শক্তিতে জগৎ পরিপূর্ণ। এই অমঙ্গল উপকরণের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রথম কর্ম্ম শরীর পোষণ; দ্বিতীয় কর্ম্ম প্রতিকূল ও বিরুদ্ধপ্রকৃতির পদার্থ হইতে আত্মরক্ষণ। এই শেষোক্ত আত্ম-রক্ষণ কার্য্যে ঘৃণা, ক্রোধ, ও ভয় ইত্যাদি বৃত্তির প্রয়োজন ঘটে। জীব-নিবহের মধ্যেও আবার মানুষের প্রাণেই এই তিনটি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। ইতর প্রাণীতে ক্রোধ ও ভয় এই দুইটি বৃত্তির ক্রিয়া পরিস্ফুট আছে বটে, কিন্তু ঘৃণার ভাব অতি মৃদু—এমন কি, অধিকাংশ স্থলেই অননুমেয়।

আদিম মনুষ্য বা বন্য বর্ব্বর এই দুই শ্রেণীর বৃত্তির প্রাবল্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, পশুর সমশ্রেণীতে বন্য জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু মানুষের সেই বন্যজীবনেও, অন্তর্নিহিত মনঃ-শক্তির ক্রমিক পরিস্ফুরণ হেতু, পশুর সহিত অচিরেই তাহার পার্থক্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুধা বন্য পশু ও বন্য মনুষ্য উভয়েরই সমানরূপে প্রয়োজনীয় বৃত্তি। পশুর ক্ষুধা সেই সময় হইতে এখনও স্বভাবজাত তৃণাদিতেই তৃপ্তিলাভ করিতেছে;—অথবা করাল মূর্ত্তিতে মুখ-ব্যাদান করিয়া একের ক্ষুধা অন্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষুধা দীর্ঘকাল ইহা পারে নাই। উহা অচিরেই অপক্ক পরিহার করিয়া, স্বভাব-পক্ক ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে,—আম মাংসে অবজ্ঞা করিয়া

অগ্নিপক্ক মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। ক্রোধাদি বৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা। পশুর ক্রোধাদি বৃত্তি, আদি সময় হইতে, সেই একই ভাবে এখনও পরিস্ফুরিত হইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, শূকর ও গণ্ডার প্রভৃতিতে ক্রোধের ক্রিয়া স্বাভাবিক পাশব-সংস্কার-হেতু, এক এক শ্রেণীর জীবে এক এক প্রণালীর হইলেও, সৃষ্টির সময় হইতে একই ভাবাপন্ন ও একই প্রকৃতিরই রহিয়াছে। মহিষের নাসিকা-ধ্বনি, খুর-তাড়ন ও শৃঙ্গ-আস্ফালন, শূকর ও গণ্ডারের এক-রেখা-গতি, ভল্লুকের বিকট চীৎকার এবং ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ও লাঙ্গুল-সঞ্চালন ক্রোধের এই সকল লক্ষণ, আদি সময় হইতে, একই ভাবে প্রকটিত হইতেছে এবং এসকল জীবের অস্তিত্ব যত কাল আছে, ঐ একই ভাবেই প্রকটিত হইবে। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সে কথা নহে। দিন দিন জ্ঞানের বিন্দু বিন্দু স্ফূর্ত্তির বলে, মানুষের ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয়ের মুখে, সংযমের বল্‌গা লগ্ন হইয়াছে। ক্রোধ প্রভৃতি অতি প্রথমে মানুষের মধ্যেও পশুত্বের উপকরণে বিলসিত ছিল। সে ক্রোধ ন্যায় বুঝিত না, অন্যায় জানিত না, সর্ব্বদাই করাল মূর্ত্তিতে পরিস্ফুরিত হইত। কিন্তু অন্তর্নিহিত জ্ঞানাদি মানবীয় অন্যবিধ বৃত্তির আংশিক আভা প্রাপ্ত হইয়াই, ক্রোধাদি বৃত্তি অগ্রে পর-পীড়ন পরিহার করিয়া, শুধু আত্ম-রক্ষণে পর্য্যবসিত হইতে শিখিয়াছে ও পাশব ক্রোধের উপরে অভ্যুত্থান করিয়াছে। পরে, সেই রৌদ্র-তেজ-সম্পন্ন ভীষণ ক্রোধই সর্ব্বশেষে-- ক্ষমার পীযূষ অঙ্গে মাখিয়া, দয়ার গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে ; তুরিত-

দুর্গন্ধময় বিকট দৃশ্য,—ঘৃণা,প্রেমের অমৃত সরোবরে অবগাহন করিয়া, দেব-ভোগ্য সম্পদ্‌বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছে। ভয় কখনও ভক্তির চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া ভদ্রবেশে মন্দির-সান্নিধ্যে উপবিষ্ট হইয়াছে, কখনও বা দুঃসাহসের কর্ণমূলে বিবেকের মন্ত্র কহিয়া পরিণামদর্শিতায় শিক্ষাদান করিয়াছে এবং নীচ কাপুরুষের সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া, ধীর বীর-সমাজেরও সংবাদ লইতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে উগ্র-অপসারিকা বৃত্তিনিচয়ও ধীরে ধীরে মানুষকে জগন্মঙ্গল্য অনুষ্ঠানে আত্মদান করিতে শিক্ষা দিয়া, তাহাকে মনুষ্য-লোকের উর্দ্ধতর সোপানে দেবলোকে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত অন্যতর সহায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।"৮

আরও এক শ্রেণীর বৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা বাকি আছে। এই শ্রেণীর বৃত্তি পশু-জগতে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কোন কোন বৃত্তির অনুরূপ কার্য্য পশু-জগতে কখন কখন দৃষ্টিগোচর হইলেও, উহা পশুর অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র স্থায়ি মনোবৃত্তির কর্ম্ম নহে—instinct বা সংস্কার-প্রণোদিত সাময়িক অনুষ্ঠান মাত্র। আদিম অবস্থায়, মানুষেও এই মনোবৃত্তি পশুত্বের প্রবল প্রবহমান মারাত্মক প্রবাহ-বেগে ভীত হইয়া, মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুররূপে প্রসুপ্ত ছিল। সেই পশুত্বের প্রবাহ ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়ায় যেমন প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে, ঐ শ্রেণীর বৃত্তিরও এক একটি তেমনই ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়া, মানুষের তদানীন্তন পাশব বিগ্রহে একটু একটু করিয়া মনুষ্যত্বের অঙ্গরাগ ফলাইয়া লইয়াছে। এই বৃত্তির সাধারণ নাম ভাবাত্মিকা বৃত্তি

বা হৃদয়িক ভাব। ইহার এক শ্রেণী --অনুরাগ, অর্থাৎ স্নেহ, বাৎসল্য, প্রীতি, আসঙ্গ-লিপ্সা ও দয়া ইত্যাদি; এবং আর এক শ্রেণী বিস্ময়, রূপজ বা গুণ-জন্য অনুরাগ (admiration), ও সসম্ভ্রম ভক্তি (reverence)। এক্ষণ এই সকল বৃত্তির বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

আদিম মনুষ্যের প্রাণে প্রথম ফুটিয়াছে, অনুরাগ (affection), --অনুরাগের সেই অঙ্গ, যাহা বিকশিত মানব-জগতে প্রেম বা প্রীতির চিরপ্রিয় অমিয়-আখ্যানে সম্মানিত। প্রথমতঃ ঐন্দ্রিয়িক বুভুক্ষা (carnal appetite) বা কাম-প্রবৃত্তি বন্য মানব ও মানবীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। এই আকর্ষণ হইতে, কালে বিকশিত হইয়াছে প্রেম বা প্রীতির পবিত্র ফুল, ও সেই ফুলে গ্রথিত হইয়াছে, কালের মহিমায়, স্মৃতির সূত্রে বিচিত্র মালা! সেই মালাই অবশেষে মানব-মিথুনের পৃথক্ ভাবাপন্ন দুইটি প্রাণকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে যত্ন করিয়াছে। আর একদিকে স্নেহ ও বাৎসল্যের অমিয়-ধারা উৎসারিত হইয়া, মানবীয় যুগল-মিলন-সম্ভূত কচি শিশুর হসিতচ্ছবিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে।

পশুযুগল ও বিহঙ্গ-মিথুনেও, অবস্থাবিশেষে, ঐন্দ্রিয়িক বুভুক্ষা হইতে প্রীতির একপ্রকার অচিরস্থায়ী ভাবের সাময়িক আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সে প্রীতির মূল --স্বাভাবিক সংস্কার বা instinct ভিন্ন আর কিছুই নহে। পশু-পক্ষীর শাবক-স্নেহও সংস্কার হইতে উৎপন্ন এবং সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত।

মানুষ সন্তানকে শুধু পশুর ন্যায় লেহন করিয়া ও পক্ষীর ন্যায় চপ্‌পুটে আহার্য্য যোগাইয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই সে উহাকে আপনারই ক্ষুদ্র প্রতি-রূপ অথবা নিজের ভাবি অস্তিত্বের প্ররোহ মনে করিয়া আদরে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছে; এবং পিতা শিশুর মুখচ্ছবিতে মাতৃ-মুখের প্রতিবিম্ব ও মাতা পিতৃ-প্রতিকৃতির ছায়া দেখিয়া স্নেহভরে, বারংবার উহার মুখ চুম্বন করিয়াছে। এই ভাব হইতেই ক্রমে সন্তানের প্রতি স্নেহের অমন আধিক্য ঘটিয়াছে। মূলে এই ভাব থাকে বলিয়াই পিতা মাতা আপন সন্তানকে যে চক্ষে দেখে, পরের সন্তানকে ঠিক্ সেই চক্ষে দেখিতে পারে না। বস্তুতঃ, আপনার ভাবি অস্তিত্বের প্ররোহ ইত্যাকার জ্ঞান সন্তান বাৎসল্য-বিকাশের পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। কারণ, দেখা যায়, কাহারও সন্তান যদি কোন কারণে মনুষ্যাকৃতি না হইয়া, অন্য কোন অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতে ভূমিষ্ঠ হয়, মাতা, পিতা তাদৃশ সন্তানের প্রতি স্নেহার্দ্র হওয়া দূরে থাকুক, উহার দর্শনে ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠেন! ইহার পরে কালক্রমে আশা কুটিয়া ঐ শিশুর অঙ্গে ভাবি স্বার্থের অনন্ত সূত্র আনিয়া জড়া-ইয়া দিয়াছে। পশু ও পক্ষীর শাবক স্নেহ শৈশবের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মানুষের স্নেহ ও বাৎসল্য যত সময় অতীত হইতে থাকে, ততই গভীর ও প্রগাঢ় হইয়া উঠে। মানুষ যখন মনুষ্যত্বে বিকশিত ও আদি মানবের অন্তর্নিহিত (carnal appetite) পাশব ঐন্দ্রিয়িক বুভুক্ষা-সঞ্জাত নিকৃষ্ট

সুখ-লালসিত আবিল আসক্তিই হেমাভ প্রেমরূপে ফুটিয়া, কখন অযোধ্যার জানকীকে অম্লানবদনে অনলে ঝাঁপ দিতে দিয়াছে, কখনও নল-বিরহিণী দময়ন্তীকে পাগলিনী বেশে রাজপথে বিড়ম্বিত হইতে দেখিয়াছে, কখনও সাবিত্রীকে একাকিনী নির্ভয়ে যমের অনুসরণে সাহসিনী করিয়াছে, এবং কখনও বা রোমিও জুলিয়েট্‌কে একে অন্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দিয়াছে। বাৎসল্য সম্বন্ধেও এই কথা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিলে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের সেই অপরিস্ফুট অঙ্কুরও ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, কখনও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে "অশ্বত্থামা হত" এই উক্তি শ্রবণে দ্রোণাচার্য্য হেন বীরের পাষাণ-বক্ষে বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস তুলিয়া দিয়া, নয়নযুগলে অশ্রুধারা কাল-সর্পাকারে প্রবাহিত হইয়াছে,—কখনও বা অযোধ্যার সম্রাট্ দশরথকে পরমায়ু সত্ত্বেও "হা রাম হা রাম"—রবে অকালে আকুলপ্রাণে ঢলিয়া পড়িতে বাধ্য করিয়াছে।

আসঙ্গ-লিপ্সাও অনুরাগেরই আর এক পর্য্যায়। যদিও অনেকেই আকাশে বলাকাশ্রেণীকে চলন্ত মালার ন্যায় উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছেন, একটা কাকের আর্ত্তনাদে সহস্র কাকের কলরব শুনিয়াছেন এবং একটি মেষ কূপে পতিত হইলে, আর দশটা মেষকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া, ঐ কূপে ঝম্প প্রদান করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, হস্তী ও বানর প্রভৃতি পশু যদিও পাল বা দল বাঁধিয়া বাস করিতে ভালবাসে,—তথাপি পাশব আসঙ্গ-লিপ্সা ও মানবীয় অসঙ্গ-লিপ্সা এক কথা নহে। পাশব

আসঙ্গ-লিপ্‌সার প্রবর্ত্তক অন্ধ সংস্কার; আর অন্য সমস্ত মনোবৃত্তির ন্যায়, মানবীয় আসঙ্গ-লিপ্‌সারও প্রবর্ত্তক, নিয়ামক ও পরিচালক অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও বিবেকের অলক্ষিত শক্তি সঞ্চার। মানুষ প্রথমতঃ পুরুষ-স্ত্রীরূপে একত্র বাস করিয়াছে; তৎপর সন্তান সন্ততি ও ভ্রাতা ভগিনী মিলিয়া একসঙ্গে বাস করিতে করিতে অন্যদীয় সংসর্গের সুখ-প্রত্যাশী হইতে শিখিয়াছে। ক্রমে যে যাহাকে, পুরুষই হউক, স্ত্রীই হউক, আপনার সমকক্ষ বলিয়া বুঝিয়াছে, অথবা যে যাহার প্রতি কোনরূপ গুণ বা রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সে তাহারই সংসর্গ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপেই ধীরে ধীরে মানব-হৃদয়ে আসঙ্গ-লিপ্সা পরিস্ফুরিত হইয়া, প্রথমতঃ এক এক পরিবার-ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে;—অবশেষে উহা পরিবারের বহির্ভাগে ছড়াইয়া পড়িয়া জাতীয় জীবনের প্রথম গ্রন্থি-বন্ধন করিয়াছে। আসঙ্গ-লিপ্সা হইতেই একে অন্যের সাহায্য অপেক্ষী হইয়াছে; এবং এইরূপে ক্রমে সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটিয়াছে। মানবীয় স্বভাবে অনন্ত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উহার অভ্যন্তরে মানবরূপে একটা মৌলিক একতা আছে। সেই একতা হইতেই আসঙ্গ-লিপ্সা এবং আসঙ্গ-লিপ্সা হইতেই প্রথম সামাজিক সম্বন্ধের সৃষ্টি, ও তৎপর সামাজিক অনুরাগের অভ্যুদয় ও জাতীয় জীবনের সূত্রপাত। এই অবস্থা হইতেই এক কালে পৃথিবীর এক অঙ্গে ফুটিয়া ছিল, আর্য্য-সভ্যতা

ও দেবভাষা সংস্কৃত লইয়া আর্য্যজাতি। আর এক অঙ্গে গ্রীক, রোমান, মৈশর ও ফিলিসিয়ান্ প্রভৃতি।

মানব-হৃদয়, যখন স্ফুরন্ত বাৎসল্য, স্নেহ, প্রীতি ও প্রেম ইত্যাদিতে প্রস্ফুট কমল-সরোবর সম সুরভিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনই ধীরে ধীরে কমলাসনা পদ্মালয়ার ন্যায়, মানব-হৃদয়রূপ কমল-সরোবরে আবির্ভূত হন, পরদুঃখ-কাতরা করুণাময়ী দয়া। দয়া আপনাকে জানে না, পরের ভাবনায় অশ্রুপাত করিয়া সুখী হয়। দয়া মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদ্। শুধু মানুষ কেন, এই দেববালা, সময় সময় পশুর প্রাণেও উকি দিয়া, পাশব অন্ধকারেও মুহূর্ত্তের তরে দিব্য জ্যোতির আভা ফলাইয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন একে একে উল্লিখিত ভাব-নিবহের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে,—একদিকে হৃদয় যেমন অন্তস্থিত রত্ননিচয়ের ক্রমিক বিকাশে আদিম বর্ব্বরকে মনুষ্যত্বের দিকে টানিয়া তুলিয়াছে, আর একদিকে জ্ঞানও আবার তাহার তহবিল পুষ্ট করিয়া লইবার নিমিত্ত যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছে। এই ব্যাপারে জ্ঞানের প্রধান সহায় বিস্ময় (wonder) এবং বিস্ময়ের নিত্য-সঙ্গিনী চিরকুতূহল-পরায়ণা অনুসন্ধিৎসা।

যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূতপূর্ব্ব বিষয়, তাহাই বিস্ময়ের উৎপাদক। জননীর স্নেহ-ঢল-ঢল প্রিয় মুখখানি ভিন্ন শিশুর কাছে সৃষ্টির অন্য সমস্তই নূতন,—সমস্তই শিশুর পক্ষে বিস্ময়-জনক। এই বিস্ময়ের ফল এই যে, শিশু যাহা কিছু পায়,

স্বভাবের বশে তাহাই ক্রমে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লয়। প্রথম চক্ষু দিয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে। দেখিতে দেখিতে উহা দ্বারা যাহা সম্মুখে থাকে তাহাতেই আঘাত করিয়া উহার শব্দ কিরূপ শুনিয়া লয়। স্পর্শানুভূতি প্রথম ধরিবার সময়েই বুঝিয়া লইয়াছে। অবশেষে মুখে দিয়া উহার স্বাদ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা শিশুর জ্ঞানের ক্ষুদ্র তহবিলটি একটু একটু করিয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। সে একবারের বেসী দুইবার জ্বলন্ত অনলে আঙ্গুল দেয় না—একবারের বেসী দুইবার কুইনাইন্ জিহ্বায় লাগায় না। শিশুর মুখে যখন কথা ফোটে, তখন যে বস্তু তাহার বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই বস্তু সম্বন্ধেই অধিকতর পরিস্ফুট অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে সন্নিহিত আত্মীয়কে ত্যক্ত করিয়া তোলে। এইরূপে তৎসংক্রান্ত জ্ঞান-সঞ্চয়ে স্বভাবের টানেই যত্নপর হইয়া থাকে।

সভ্য-জগতের শিশু সম্বন্ধে যে কথা, আদিম মানব বা মানবজাতির আদি শিশু সম্পর্কেও সেই কথা। তাহার মনেও সৃষ্টির সমস্ত পদার্থই একে একে বিস্ময়ের ভাব সন্ধুক্ষিত করিয়া তাহার হৃদয়ে অনুসন্ধিৎসা বা অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে এবং এইরূপে তাহাকে সেই সমস্ত পদার্থের পরিচয় লাভ ও তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। বহু পরীক্ষা ও বহু গবেষণার পরে সে যখন কোন বিস্ময়কর পদার্থের পরিচয় পাইয়াছে—অর্থাৎ উহার দোষ, গুণ, আকৃতি ও প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, তখনই তৎ-সংক্রান্ত বিস্ময়ের ভাব অন্ত-

ষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অদ্ভুত-দৃশ্য পদার্থনিচয় পুরাতন হইলেও, ঐ সকলের মধ্যে যেটি সুন্দর বা কোনরূপে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক দুর্ল্লভগুণে অলঙ্কৃত, সেটি বিস্ময়ের মহিমা হারাইয়াও, মানবের মনে রূপজ বা গুণ-জন্য একটা বিশেষ অনুরাগ বা আসক্তির (admiration) ভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বিস্ময় জ্ঞানসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষার সন্ধুক্ষণ করিয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ বিষয়ে সহায়তা করে। রূপজ বা গুণজন্য অনুরাগ মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে তুলিয়া লইবার জন্য আর এক দিক্ দিয়া আর একটা পথ খুলিয়া দেয়। যথার্থ গুণানুরাগ মানব-হৃদয়ের বস্তুতই বড় দুর্ল্লভ সম্পদ্। যে পরগুণে বিদ্বিষ্ট, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে ধনে সম্পদে রথ্চাইল্ডের উত্তরাধিকারী বা যক্ষরাজ কুবেরের বে-নিকাসী কোষাধ্যক্ষ হউক, পদ-মর্য্যাদায় সিংহাসনাধিরূঢ় সম্রাট্ বা সম্রাটের দক্ষিণ বাহুরূপে সম্মানিত রহুক, অথবা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাসের সহিত তুলিত হইতে থাকুক, তথাপি সে প্রাণের অভ্যন্তরে সেই আদিম বর্ব্বরেরই আদর্শ-স্থানীয়, সন্দেহ নাই। সে এ পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের ত্রিসীমায়ও পঁহুচিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যে পর-গুণানুরাগী বা পরগুণমুগ্ধ, সে কুটীরের কাঙ্গাল হইলেও, মানুষ-রূপে সম্মান পাইবার যোগ্য এবং প্রকৃতই মনুষ্যত্বের সোপানারূঢ় মনুষ্য। সে জীবনের স্তরে ক্রমে ঊর্দ্ধে আরোহণের পথ পাইয়াছে, তাহার অন্তঃ-স্ফুরিত গুণগত প্রেমই তাহাকে ক্রমে নানাগুণে অলঙ্কৃত করিয়া, উন্নতির দিকে টানিয়া লইতেছে।

মানুষ ক্রমে বিবেকের স্ফূর্ত্তি হেতু আপনার দিকে চাহিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া, সে প্রতিনিয়তই আপনার সহিত তুলনায়, অন্যকে দেখিতে শিখিয়াছে। সে আপনাতে যে শক্তি, যে সৌন্দর্য্য বা যে গুণ খুঁজিয়া পায় নাই, তাহাই যখন অন্যের ভিতরে দেখিতে পাইয়াছে, তখন আত্মার আভ্যন্তরিক অবস্থানুসারে, কখনও হিংসার বৃশ্চিক-দংশনে ক্লিষ্ট, কখনও বা রূপ বা গুণানুরাগে মুগ্ধ ও হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভাব সসম্ভ্রম ভক্তি (reverence)। ভক্তিবৃত্তির বিকাশ হইলেই মানুষ আপনা হইতে উচ্চতর শক্তি, গুণ বা মহিমান্বিত ব্যক্তির নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া এবং প্রাণের অনুরাগে তাঁহার চরণে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে।

মানব-মনের এই উচ্চতম বৃত্তি ভক্তি মানবীয় হৃদয়-উদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রস্ফুট প্রসূন। এই প্রসূনের স্বাস্থ্যকর সুবাতাসে সে ক্রমেই ঊর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভক্তিবৃত্তি, শুধু উচ্চতর গ্রামের উচ্চতর মানুষ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও শক্তিশালী বীর বা পুণ্যপুঞ্জময় সাধু মহাত্মার চরণে মাথা নোয়াইয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই; ভক্তি প্রাকৃত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, মনোময় জগতের ঊর্দ্ধতম উচ্চতায় উত্থিত হইয়াছে এবং জগন্ময় জগজ্জীবন অনন্তদেবের পাদ-পদ্মে প্রাণটা ঢালিয়া দিতে প্রয়াসপর হইয়াছে।

মনুষ্যত্ব ক্ষুদ্র কথা নহে। অনেক দিক্ দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমরা এইক্ষণ উহার আরও কএকটা দিকের কথা বলিব। মানুষের জ্ঞান দ্বিবিধ—আপনার অস্তিত্ববিষয়ক অনুভূতি ও আত্মেতর জ্ঞান। আত্মেতর জ্ঞানের বহু পূর্ব্বে আত্ম-অনুভূতির বীজ অঙ্কুরিত হয়। আত্ম-অনুভূতি বা আত্ম-অস্তিত্ব-সংক্রান্ত জ্ঞান ও আত্মেতর জ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞান-সঞ্চয়েই মূলে একটি নিগূঢ় অভিপ্রায়, কর্ম্মে প্রবর্ত্তনা জন্মাইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কতকগুলি মনোবৃত্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত-রূপে মনকে অভিপ্রেত বিষয়ের অভিমুখে অন্ধভাবে লইয়া যায় এবং মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ বা সংস্কাররূপে পরিগণিত হয়। এতদ্ব্যতীত আর যে কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে, সে সকলের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি, আত্ম-অনুভূতি ও ভূয়োদর্শন-সাপেক্ষ। এই শ্রেণীভুক্ত মনোবৃত্তির মধ্যেও কএকটির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্রথমোক্তের নাম মুখ্য ও শেষোক্তের নাম গৌণ। গৌণ মনোবৃত্তিসমূহ আর কিছুই নহে,—আত্ম-জ্ঞানের ঐন্দ্রজালিকস্পর্শে রূপান্তরিত মুখ্য মনোবৃত্তি মাত্র। মুখ্য মনোবৃত্তিগুলির কার্য্য আত্ম-নিষ্ঠ বা আত্ম-গত ভাবে সীমাবদ্ধ; গৌণ মনোবৃত্তির কর্ম্ম পর-নিষ্ঠ বা পরগত। নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি-স্পৃহা বা বুভুক্ষা মুখ্য বৃত্তির কার্য্য। চিত্তে পরকীয় ক্ষুধার অনুভূতি গৌণ মনো-বৃত্তির কার্য্য। আত্ম-ক্লেশের অনুভূতি মুখ্য মনোবৃত্তির ক্রিয়া, পরক্লেশে সহানুভূতি গৌণ মনোবৃত্তির অনুষ্ঠান।

মুখ্য ও গৌণ মূলে একই বস্তু হইলেও, মনোবিজ্ঞানে গৌণ মনোবৃত্তিগুলির জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মুখ্য মনোবৃত্তি সকল যখন গৌণ মনোবৃত্তিরূপে রূপান্তরিত হয়, তখন এতদুভয়বিধ প্রবৃত্তির মধ্যে নৈতিক পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। মানুষ যে দূরদৃষ্টি-বিহীন অভি-প্রায়-শূন্য প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেনা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক শ্রেণীর দার্শনিক সমস্ত প্রবৃত্তিমূলেই 'লালসা-পরিতর্পণ-ইচ্ছা' দেখিতে পান। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের যাবতীয় কার্য্যই বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একথা ঠিক্ হইলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মনের স্বাভাবিক অবস্থা, প্রবৃত্তি-নিচয়ের সাম্য জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা। বাসনা পরিতর্পণ ইচ্ছার সময় সময় এই সকল ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে। মন বাসনা-প্রণো-দিত হইয়াই জড়তা পরিহার করিয়া, কার্য্যরূপে পরিস্ফুট হয়। এক্ষণ কথা এই—চিত্ত-বৃত্তির স্ফূর্ত্তিবিষয়ে ইচ্ছাই যদি হয়, একমাত্র নিয়ামিকা, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম কোথা হইতে বা কি প্রকারে, এই পরিতৃপ্তির আস্বাদ গ্রহণ ঘটিল! অনাস্বাদিত ভোগে ইচ্ছার গতি সম্ভবপর নহে। ইচ্ছা তাহারই পানে ধাবিত হয়, যাহার স্বাদ-পরিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। চিত্তবৃত্তিকে পরিতৃপ্তির পথে চালিত করিবার নিমিত্ত অন্য কোন শক্তিই যদি কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে পরিতৃপ্তি কি আপনা হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছে, অথবা ইন্দ্রিয় নিচয়ই অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তির পরিচালনায়, অতর্কিতভাবে পরি-

তৃপ্তির আস্বাদ লাভ করিয়া, তৎপ্রতি ইচ্ছাকে জাগরিত করিয়া লইয়াছে? মানবের মনোবৃত্তিগুলি যেন জড়বৎ সমভাবাপন্ন; উহাদিগের উত্থান নাই—পতন নাই,—আবেগ নাই—উচ্ছ্বাস নাই, উহারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট। বহির্জ্জগৎ এই পুঞ্জীভূত, সুষপ্ত ও নিশ্চেষ্ট মনোবৃত্তির সমীপস্থ হইয়া যেন তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়; আর উহারা কিছুক্ষণ করিয়া আবার জড়বৎ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। এইরূপে বহির্জ্জগৎকে ক্রিয়াশীল ও অন্তর্জ্জগৎকে একবারে নিশ্চেষ্ট জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে।

যে দার্শনিক সম্প্রদায় ঈদৃশ মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই নিত্য-পরীক্ষিত সত্য ভুলিয়া যান যে, সংস্কার-শক্তি ব্যতিরেকে জগতে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব। কারণ, সংস্কার-শক্তিবশে অন্তর্জ্জগৎ প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল। বহির্জ্জগৎ সেই ক্রিয়ার উপলক্ষ, আশ্রয় ও অবস্থা বিশেষে, সেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্‌বোধক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্তঃ-প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীব কর্ম্মপর না হইলে, বহির্জ্জগৎ একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়িত। এমন কি, উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। খাদ্য অতর্কিত ভাবে কখনও মুখে যাইয়া পড়ে না, নদীর জল আপনা হইতেই ঠোঁটে আসিয়া লাগে না; শীতে বাতাস বহিলেই কম্বল মানুষের গায়ে জড়াইয়া রহে না, এবং বসন্ত সমীর প্রবাহিত হওয়া মাত্রই সেই কম্বল আপনি গাত্র হইতে খসিয়া পড়ে না। যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায়ই খাদ্য রুচিকর, তেমন চিত্ত-বৃত্তির স্ফুর্ত্তিতে সুখ, দুঃখ,

আনন্দ ও নিরানন্দের অনুভূতি; সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও নিরানন্দের অনুভূতিতে চিত্ত-বৃত্তির স্ফুর্ত্তি নহে। বস্তুতঃ বহির্জ্জগৎ নিষ্ক্রিয় উপলক্ষ মাত্র—অন্তর্জ্জগৎই সমস্ত কর্ম্ম-শক্তির প্রস্রবণ। অন্তর্জ্জগতের এক শক্তি জ্ঞান, আর এক শক্তি ভাবাত্মিকা বৃত্তি। ভাবাত্মিকা হৃদয়-বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে অনন্ত পরীক্ষা, অনন্ত ভ্রম-ভ্রান্তি, ও তজ্জন্য প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত অনন্ত শাস্তি ভোগের পরে জ্ঞান-বিবেক দ্বারা শাসিত হইয়া আদি বন্য বর্ব্বরকে একটু একটু করিয়া মানুষের পদবীতে তুলিয়া লইয়াছে। একদিকে যেমন আত্ম-অস্তিত্বের অনুভূতি বা জ্ঞান অঙ্কুররূপে উদ্গত হইয়া, কালে প্রস্ফুট তরুতে পরিণত হইয়াছে, পরে আত্মেতর জ্ঞান উহাতে যোজিত হইয়া, সেই তরুকে মহীরুহরূপে দাঁড় করাইয়া অসংখ্য জীবের আশ্রয় স্থান করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনই ভাবাত্মিকা বৃত্তির নির্ঝরিণী মানবের হৃদয়-কন্দরে কেন্দ্রীভূত রহিয়া প্রথমে আত্ম-প্রেম বা আপনার প্রতি ভালবাসারূপে ফুটিয়াছে। পর্ব্বতের পাষাণ গহ্বর-সঞ্চিত বারিরাশি যখন উৎস-মুখে পথ পাইয়া, একবার বাহিরে ফুটিয়া পড়ে, তখন আর উহা ঐ পর্ব্বত গুহায় নিবদ্ধ থাকিতে পারে না, বেগে বহির্গত হইয়া খরবাহিনী প্রবাহিনীরূপে দেশের পর দেশ প্লাবিত করিয়া, মহাসমুদ্রের অন্বেষণে ধাবিত হয়। প্রেমও এই শ্রেণীর পদার্থ। ইহা প্রথমতঃ স্ব-সুখের অনুসন্ধানে আত্মগত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহে। ক্রমে উহাতে আর ইহার তৃপ্তিবোধ থাকে না। প্রেম

চিরদিনই পরমুখপ্রেক্ষী। সুতরাং ইহা স্বভাববশেই পরমুখ-প্রেক্ষী হইয়া পরকীয় সুখ-সন্ধানে পরের দিকে গড়াইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কখনও স্বেচ্ছানুরূপ খাত কাটিয়া এই নবোদ্গত প্রবাহকে দগ্ধমরুর জ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত মরুর ভিতর দিয়া বহাইয়া লইয়া গিয়াছে; কখনও ইহা দয়ার সঞ্জীবন-সঙ্গমে, গঙ্গা-যমুনা সংযোগে প্রয়াগ রচনা করিয়া, প্লাবন-বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে; কখনও বা বিবেকের মুখে ভক্তির শঙ্খ-ধ্বনি শুনিয়া শত প্রবাহ মহাসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রেম বা প্রীতি যখন আপনা ছাড়িয়া পরের কথা ভাবিতে শিখে, তখনই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিকৃতি ন্যায়পরতার বিকাশ ঘটে। ন্যায়পরতার সেবায় দীক্ষিত হইয়াই মানুষ আত্ম-স্বার্থের আবিলতা পরিহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ন্যায়পরতার চক্ষে আমাতে তোমাতে ও তাহাতে প্রভেদ নাই। সে সকল সময়ে সকল অবস্থারই সকলকে আপন আপন যোগ্যতানুরূপ অধিকার তৌলে মাপিয়া দিতে প্রস্তুত। কাকুতি মিনতি, উপরোধ অনুরোধ বা অশ্রুজল কিছুতেই ন্যায়পরতার কঠোর প্রাণ আর্দ্র হয় না—কিছুতেই তাহার তৌল-দণ্ডের কাঁটা হেলে না। কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্যই কখনও ইহার আংশিক কখনও পূর্ণ ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু বিকার, ব্যভিচার বা আবিলতা না আছে কোন্ মনোবৃত্তির? প্রেম যেমন অবস্থাবিশেষে নরকের ক্লেদ, দয়া যেমন ঘৃণ্য হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং ক্ষমা যেমন ভীরুতার অপবাদে প্রকৃতই

কলঙ্কিত হইবার যোগ্য হইয়া পড়ে, ন্যায়পরতার কাঁটাও তেমনি অস্থানে হেলিয়া, পক্ষপাতিতা নামে অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়ে। মানব-জগতে এই দেব-সম্পদের সদ্ভাব ঘটিলেও, এই বিকার সম্ভাবনা কেন থাকিয়া যায়, এই প্রশ্নের একমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বা প্রবর ও অবরাত্মার সংমিশ্রিত শক্তি মনোজগতে এখনও চির ক্রিয়াশীলা রহিয়াছে এবং আরও কতকাল এইরূপে ক্রিয়াশীল রহিবে তাহা অনিশ্চিত।

যশো-লিপ্সা ও প্রভুত্ব-স্পৃহা মানব-মনে এই দুইটি বৃত্তিও মানবীয় বিকাশের পথে অসামান্য সহায় বা উপাদানীভূতশক্তি। যশোলিপ্সা নাম শুনিলেই হয়ত, দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে বিকশিত সর্ব্বগ্রাসিনী যশো-লালসার লোলরসনা স্মরণ করিয়া অনেকে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন! প্রভুত্ব-স্পৃহার নামে হয়ত অনেক ভুক্তভোগী আপন আপন ঘাড়ে-চাপা প্রভুরূপী রাবণ, কুম্ভকর্ণ বা জরাসন্ধ নিচয়কে মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিবেন! কিন্তু ঐ সকল যশোপিপাসা ও প্রভুত্ব-স্পৃহার বিকার-সম্ভূত বিষফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দুই বৃত্তি যদি জ্ঞান, বিবেক ও ন্যায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিত রহিয়া বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে এই দুইটি মনোবৃত্তিই অবিশ্রান্ত পীযূষ-প্রসূরূপে সম্মানিত ও সম্পূজিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষ অনেক সময় যশঃ-স্পৃহার সন্ধুক্ষণেই অনেক প্রকার সদনুষ্ঠানে

উৎসাহিত হইয়া থাকে। প্রভুত্ব-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়াই সে জগন্মঙ্গল্য অসংখ্য শক্তির সাধন ও দুর্ল্লভ সম্পদ্-সঞ্চয়ে প্রয়াস-পর হওয়া আবশ্যক মনে করে। সুপরিস্ফুট, সুপার্জ্জিত ও সুপরিচালিত প্রভুত্বের নাম আত্মম্ভরিতা নহে—আত্ম-ত্যাগ; —সে প্রভুত্ব, প্রভুত্ব নহে—সেবা-ব্রত বা সেবকত্ব। তাদৃশ যশের নামও প্রশংসার হুহুঙ্কার বা গর্ব্বের জয়-ঢাক নহে, আত্ম-প্রসাদের অন্তঃপ্রবাহিত অস্ফুট মুরলী বা পরার্থ আত্মত্যাগ-ব্রতের চরম সিদ্ধি অথবা অযাচিত বরাশীর্ব্বাদ। এই শ্রেণীর প্রভুত্ব ও যশোলালসা দেবতারও বাঞ্ছনীয়। যশোলালসা ও প্রভুত্ব-স্পৃহার ক্রম-বিকাশে আদিম মনুষ্য মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে অনেকদূর অগ্রসর ও মনুষ্য-নিবাস পৃথিবী, অনন্ত রাজ্য, সাম্রাজ্য ও সম্পদ্-বৈভবে বিভূষিত হইয়াছে। এই দুই প্রবৃত্তি হইতেও জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য ও বীরত্বের বিবিধ জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইয়া, মানুষের ইতিহাসকে নিত্য নূতন আলোকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে।

সমুদ্রের অতলগর্ভে লুক্কায়িত অমৃত-ভাণ্ডের ন্যায় আদিম মনুষ্যের প্রাণে আর একটি ভাব অস্তিত্বশূন্যবৎ নিশ্চেষ্ট ও প্রসুপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। ইহা স্নেহ, প্রীতি, দয়া ইত্যাদির ন্যায় একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। ইহা মানবীয় প্রাণের উচ্চ শ্রেণীস্থ মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্মিলিত শক্তি-সম্ভূত ফল বা ভাব বিশেষ। আদিম বন্য বর্ব্বর বা শিশু-ভাবাপন্ন আদি মানব যখন প্রথম মনুষ্যরূপে নয়ন উন্মীলন করিয়াছে, তখন সে বুঝিয়াছে,

জগতের সমস্তই তাহার পর; সে দেখিয়াছে আপনাকে—এবং চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে আপনাকে। তাহার এই সময়ের প্রথম জ্ঞান—"আমি ও আমার।" সে প্রথমে নিজে নিজের জন্য এই জ্ঞান ও অনুভূতি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইহার পরে পরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বহু যুগযুগান্তের পরে বুঝিয়াছে,—'আমি শুধু আমারই জন্য, এমন কথা নহে, প্রত্যেকেই নিজে নিজের জন্য'। ইহার পরে, দেবাসুরে মিলিয়া সাগর-মন্থনের ন্যায়, তাহার অন্তর্জ্জগতে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির সংঘর্ষে হৃদয়-পয়োধি অবিশ্রান্ত মথিত হইতে হইতে কালক্রমে রত্নের পর রত্ন উত্থিত এবং বন্য বর্ব্বর ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের কৌস্তুভ-মণিহারে বিভূষিত হইতে হইতে, অবশেষে সে বুঝিতে পারিয়াছে,—'জগতে কেহই নিজে নিজের জন্য নহে, প্রত্যেকেই সকলের জন্য;—আমি আমার নহি,—আমি সকলের'। এই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি মাত্রই মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত যৌবন-দশাগ্রস্ত আদি মানবের নয়ন-সান্নিধ্যে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও স্বর্গীয় সৌরভে তাহাকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। সে আপনাকে হারাইয়া জগতের সহিত যেন সমবেদনার ভাবে একপ্রাণে মিশিয়া যাইতে সুখানুভব করিয়াছে। মনোবৃত্তির যুগযুগান্তব্যাপি বিঘট্টনে বিমথিত মানব-প্রাণে 'আমি ও আমার'—স্বার্থপরতার এই সঙ্কীর্ণ জ্ঞান হইতে 'আমি আমার নহি—আমি সকলের—আমি এই সমস্ত জগতের', এই সর্ব্বত্র-প্রসর মহাজ্ঞান ফুটিয়া উঠিলে, বহু আয়াস-সাধ্য কঠোর সাধনার পরে, প্রকৃতই

চিরবাঞ্ছিত দুর্ল্লভ অমৃত-ভাণ্ড মানবজাতির হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। যে এই অমৃতের একবিন্দু পাইয়াছে, সে-ই কৃতার্থ হইয়াছে। যে ভাগ্যবান্ ইহা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া পান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়া, জগতে ধন্য হইয়া রহিয়াছেন। দানব-প্রকৃতি অসুর লোভ-বশে বা স্বার্থ-সুখের প্ররোচনায় ছদ্মবেশে এই অমৃত পান করিয়াও, একেবারে বিফলমনোরথ হয় নাই। আসুর-স্বভাব-হেতু অকালে ছিন্নগ্রাব হইয়াও, সে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে, দেবতা না হইতে পারিলেও, রাহুরূপে পুণ্য-প্রসঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে এবং গ্রহ-বৈগুণ্যে বিপন্ন ব্যক্তির নিকট সময় সময় পূজার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছে।

এই অমৃত পান সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যে এখনও ঘটে নাই; কখনও সামান্যরূপে সকলের ভোগে ইহা আসিবে কি না, মানব-হৃদয়ের দানবনিচয়কে বঞ্চিত বা বিধ্বস্ত করিয়া, প্রীতি কখনও কমনীয় কান্তিতে মোহিনী সাজিয়া, মানব-জগতের সকলকে এক সঙ্গে এই সুধা বাঁটিয়া দিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাহা সুদূর ভবিষ্যতের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কথা। সে বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু মানুষ যে এই মহাভাবের স্ফুরণে তাহার এই পার্থিব অন্ধকারেও সময় সময় চপলা-চমকের ন্যায় ত্রিদিবের সুখ-শীতল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে সমর্থ হইতেছে, তাহাতে আর কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

মানবীয় অন্তর্জ্জগতে উল্লিখিত প্রবৃত্তির অঙ্কুর বা মনোবৃত্তি নিচয় ক্রমে প্রস্ফুট হইয়া মানব-জগতের বিকাশ-সাধন করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবীয় বিকাশের ধারাবাহিক ইতি-হাস সঙ্কলন মানুষের সাধ্য নহে। বাজ হইতে কিরূপে মহা-মহীরুহের উদ্ভব হয়, মহীরুহের পক্ষে যেমন তাহা জানা অসম্ভব, মানুষের পক্ষেও তেমন এই তত্ত্ব অবধারণ অসম্ভব। মহীরুহের বিকাশ-প্রক্রিয়ার দ্রষ্টা মানব; মানবীয় বিকাশের দ্রষ্টা কে? তথাপি মানুষ তাহার চিন্তাশক্তির কঠোর ব্যায়াম দ্বারা আত্ম-বিকাশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে না পারিলেও, কতেক কল্পনা-বলে, কতেক বা এখনও মানব-জগতের কোন না কোন অঙ্গে বন্য বর্ব্বরের সেই আদিম মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, কোন অঙ্গে অর্দ্ধ সভ্যের দেহে পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব অন্ধকার ও আলোকের সংমিশ্রণ এবং কোন কোন স্থানে মনুষ্যত্বের বিকশিত উজ্জ্বল আবরণ পরীক্ষা করিয়া, যুক্তি ও অনুমান-বলে এই তত্ত্বের এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক! এইক্ষণ আমা-দিগের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি একবার মনোনিবেশ করুন। মানব-জগতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্বতই এই ধারণা হয় যে, মানবজাতি মনোবৃত্তি বা মনঃ-শক্তির ক্রমিক বিকাশে সোপানের পর সোপানে—স্তরের পরে স্তরে উত্থিত হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং কালে আরও ঊর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে।

আত্মা কর্ত্তা। মন, মনঃ-শক্তি ও মনোবৃত্তি আত্মার গুণ। মনঃ-শক্তি কার্য্য করে,—জীবাত্মা সেই সকল শক্তিকে কার্য্যে যোজনা করিয়া দেন। এই কর্ম্ম-প্রয়োজক জীবাত্মা, গুণ বা অবস্থাভেদে দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। গুণ,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবস্থা,—প্রবব ও অবর ভাব। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ঋষি-কথিত গুণত্রয়ের পাশ্চাত্য সমন্বয়। প্রবর ও অবর আত্মার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণ এই প্রবর ও অবরাত্মার গতি ও কার্য্য সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। প্রবর ও অবর আত্মার বশে মানবীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত মনোবৃত্তি নিচয়ের উদ্বোধন। মানবের বিকাশ ও অবিকাশ, উত্থান ও পতন, সেই মনোবৃত্তির বহিঃপরিস্ফুট কার্য্য-ফল।

মানুষের অন্তর্নিহিত Higher self ও Lower self প্রবর ও অবরাত্মার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী বিবিধ মনোবৃত্তির প্রভাবে ও পরস্পর সংঘর্ষে মানব-জীবনে এক একটা উচ্চ বা নীচ স্তর সংগঠিত হইয়াছে। Lower self—অবর বা নিম্নতল আত্মার অভিব্যক্তি Egoism বা আত্মার্থপরতায়; আর Higher self—প্রবরাত্মার অভিব্যক্তি Altruism—পরার্থপ্রীতি বা পরার্থপরতায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানবজাতির শৈশব অবস্থায় নিম্নতল বা অবরাত্মার প্রাবল্যহেতু, Egoism বা আত্মার্থপরতার সমধিক বিকাশ ঘটিয়া থাকে। তখন

সকলেই জীবনের নিম্নতম স্তরে দাঁড়াইয়া, অদম্য ভোগ-তৃষ্ণায় অধীর রহিয়া, রাক্ষসের লোল-রসনা বিস্তার করিয়া দেয়; এবং অহোরাত্র কেবল আত্ম-তৃপ্তির জন্যই অধীর থাকে। কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই, এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। সে প্রতিনিয়তই বিশ্ব-নিয়ন্তার অনতিক্রম্য নীতি-বলে, অভ্যন্তরস্থিত পূর্ব্ব-বর্ণিত উপাদান-সাহায্যে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য। অবরাত্মার প্রাবল্য-কালে, সকলেরই আত্মার্থপরতা অপরিসীম থাকে। সকলেই একাকী বিশ্বকে গ্রাস করিতে সমুৎসুক হয়। ইহাতে অচিরেই পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া পড়ে এবং অবরাত্মার মারাত্মক কোলাহলেই যেন প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত প্রবরাত্মার নিদ্রাভঙ্গ ঘটে। প্রবর ও অবরাত্মার সংঘর্ষে শেষে আপনি এক প্রকারের সাম্যভাব বা সমতার সৃষ্টি হয় এবং তদানীন্তন মানবদিগকে নিম্নতর স্তর হইতে, স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, উন্নততর মধ্যবর্ত্তী স্তরে টানিয়া লইতে চেষ্টা করে।

এই মধ্যস্তরে উপনীত হইলেও, সময় সময়, ব্যক্তিগতভাবে অবরাত্মার প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর না হয়, এমন নহে; কিন্তু তাহা হইলেও, জাতিগতভাবে চিন্তা করিলে, তখন মোটামুটি প্রবর ও অবরাত্মার সাম্যভাবই পরিলক্ষিত হইবে। ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যক্তিবিশেষের অবরাত্মা প্রবরাত্মার উপরে অনুচিত আধিপত্য ফলাইতে প্রয়াসপর হয়, সন্দেহ নাই; এবং

তাহাতে, সময় সময়, মারাত্মক ফল প্রসূত হইতেও দেখা যায় সত্য, কিন্তু তথাপি প্রত্যাখ্যাত প্রবরাত্মা, বিবেকের তাড়না দ্বারা, কর্ম্মের দিক্ দিয়া, অবরাত্মার প্রাবল্যজনিত অপচয়ের ক্ষতি পূরণে নিয়ত যত্নশীল রহে। সুতরাং, মানুষ জীবনের মধ্যস্তরে উপস্থিত হইবার পরে, জাতিগতভাবে ত নয়ই, ব্যক্তিগতভাবেও অবরাত্মার একাধিপত্য মানিয়া চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু নিম্নতম স্তরে অর্থাৎ মানবজাতির আদিম অবস্থায় বিবেকের তাড়না না থাকা হেতুই, এই অবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। যদি সেই আদিম সময়ের তুলনায়, বর্ত্তমান সভ্যভাবাপন্ন মানুষের প্রাণ-নিহিত ভক্তি, দয়া ও প্রেম-ধর্ম্মী প্রবরাত্মা, বহু পরিমাণে অধিকতর পুষ্টিলাভ না করিত, তাহা হইলে, তাহাদিগের মধ্যে এই বর্ত্তমান যুগেও বিবেকের তাড়না এমনই ভাবে উপলব্ধ হইত কি না, সন্দেহ।

পূর্ব্বেই বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে, মানুষের কতকগুলি বৃত্তি পশুর সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত,—কতকগুলি স্বতন্ত্র। ইহাও বলা হইয়াছে যে, মানুষের ভিতরে এই স্বতন্ত্র বৃত্তিগুলি আছে এবং এই সকল বৃত্তি দ্বারা পাশববৃত্তিগুলি প্রতিনিয়ত সংযত ও অনুশাসিত রহে বলিয়াই, মানুষ পশু হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর পদবীস্থিত উচ্চতর জীব। মানুষের এই স্বতন্ত্র বৃত্তিগুলি প্রবরাত্মার অনুমোদিত, অথবা প্রবরাত্মা এই সকলেরই যেন সমষ্টীভূত পদার্থ। আহার, নিদ্রা, মৈথুন,

ভয়, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তির ফল, সেই সকল বৃত্তিতেই মানুষের সহিত পশুর সমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং এই সকল বৃত্তিই অবরাত্মার মূলধন বা পুঁজি। মানুষ যখন এই সকল বৃত্তির পরিতর্পণার্থ অনুচিত মাত্রায় চেষ্টা করিতে থাকে, তখনই অবরাত্মার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। মানবীয় বিকাশের মধ্যযুগে যদি বিবেকের তাড়নারূপ একটা অভিনব ভাবের সংঘটন না হইত, তাহা হইলে, শুধু কৃত-কর্ম্মের তন্ত্ত-বিচ্ছেদ বা সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা অবর ও প্রবরাত্মার সমতা রক্ষা করিয়া চলা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িত।

মানুষ যখন যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, সে অধিকাংশ স্থলেই কার্য্য করিবার সময়েও, ভাল করিতেছে কি মন্দ করিতেছে, সম্যক্ না হইলেও, কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা অনুমান করিতে পারে। কিন্তু কার্য্যকালের সেই মুহূর্ত্ত চলিয়া গেলে, চিত্ত-বৃত্তি গুলিতে যখন উত্তেজনার পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিগুলি যখন অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে, মস্তিষ্ক শীতল ও প্রকৃতিস্থ হইয়া আইসে, তখনই স্বাভাবিক বুদ্ধি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্ম্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়। কার্য্য ভাল হইলে, প্রবরাত্মার উচ্চতর বৃত্তিগুলি স্পৃষ্ট হয়; এবং হৃদয় ও মন এক বিমল আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। আর কার্য্য মন্দ হইলে, সেই উচ্চতব বৃত্তিগুলি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে ও প্রাণে একটা অসহ্য জ্বালার সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্রবরাত্মা ও অবরাত্মা, এই দ্বিবিধ মানবীয় আত্মারই তৃপ্তির ব্যবস্থা আছে। প্রবরাত্মার তৃপ্তি, বিমল আনন্দ-রসে;—স্ফটিক-ধবলা ভাগীরথীর পুষ্টিকর পুণ্য-প্রবাহে; আর অবরাত্মার তৃপ্তি বাড়বানল-উদ্গারি তরঙ্গায়িত সুখের প্রদাহি প্রবাহে। এই দ্বিবিধ তৃপ্তি বা সুখ এক শ্রেণীর পদার্থ নহে। ভোগ-সময়ে ভোক্তার প্রাণেই তাহা সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আমরা কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোন পথিক্, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়, চারি কিংবা পাঁচ হাজার টাকা লইয়া, একটা জনশূন্য নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সময়ে, আর এক ব্যক্তি অবরাত্মাব প্রণোদনায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ স্থানে আসিয়া ঐ পথিকের মাথা কাটিয়া, টাকাগুলি অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পরেই, তাহার প্রাণে প্রথম উদ্ভূত হইবে রাজদণ্ডের ভয়। কিন্তু অবরাত্মার প্রাবল্যে অঙ্গীভূত আদিম মনুষ্য, যে ভয়ের বিভীষিকায় কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকে, এই ব্যক্তির সেই ভয়ের হাতে অব্যাহতি লাভও তেমন দুষ্কর কর্ম্ম নহে। সে অনায়াসেই মৃতদেহটাকে সেই নির্জ্জন বনে এমনভাবে লুকাইতে সমর্থ যে, কেহই উহার সন্ধান পাইতে পারিবে না। দৈবাৎ কেহ সন্ধান পাইলেও, লব্ধ অর্থের কিঞ্চিৎ দিয়াই সে তাহার মুখ বন্ধ করিতে পারে। শুধু ইহাই নহে, ধরা পড়িয়াও অর্থবলে ও তদ্বিরের গুণে আইনের খপ্পর হইতে মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইতে পারে। যদিও

ভয়ের হাতে অব্যাহতি লাভ করিয়া এইরূপে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ হওয়া সর্ব্বথা সম্ভবপরও হয়, তথাপি সে এই ভয়াবহ কুৎসিত উপায়ে লব্ধ অর্থরাশি ভোগ করিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় কি ? লোভ-বৃত্তির তৃপ্তি-সাধন মাত্রই, লোভ বিষয়ে ক্ষণকালের তরে চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইবে। যেই চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইবে, অমনই প্রাণের নিভৃত কক্ষে প্রসুপ্ত দয়া, মায়া ও প্রীতি প্রভৃতি প্রবরাত্মার ভাবনিচয়, আপনি জাগিয়া উঠিবে; এবং ইহারা জাগরিত হইলেই, বিবেক তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণশূল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে। অবরাত্মার লোভ তৃপ্তি লাভ করিল, কিন্তু এই তৃপ্তি কিরূপ জ্বালাদগ্ধ ও ভীষণ এবং ইহা সর্ব্বথা প্রদাহি সুখ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য কি না, বোধ হয়, এই দৃষ্টান্তটির বিষয় একটু চিন্তা করিলে সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবরাত্মার তৃপ্তি হইল, কিন্তু প্রবরাত্মা বিবেকের বহ্নি জ্বালিয়া দিয়া, অবিশ্রান্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল,—'পথিক তাহার টাকার থলী লইয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছিল, তুমি কেন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, বিনা অপরাধে, তাহাকে হত্যা করিলে ?' এই কৈফিয়তের প্রত্যুত্তর নাই। বিবেকের তাড়না অপেক্ষা অধিকতর কঠোর শাস্তি সংসারে আর কিছু আছে কি ?

মানব যখন জীবনের মধ্যস্তরে, তখনই বিবেকের ঈদৃশী তাড়না সম্ভবপর। কিন্তু মানব যখন আদিম অবস্থার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত ছিল, তখন এই অবস্থা ছিল না। তখন তাহারা

পরস্পরকে সামান্য স্বার্থের জন্যও, কোন দিকে ভয়ের কোন আশঙ্কা না থাকিলে, অবলীলাক্রমে হত্যা করিয়া বসিত এবং হত্যা-লব্ধ বস্তু-দ্বারা অক্ষুণ্ণচিত্তে স্বকীয় সুখ-লালসার তৃপ্তি সাধন করিত। কোন প্রকার অনুতাপ বা আত্ম-গ্লানির কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

যদি বল, এই বিবেকের তাড়না কেবল সংস্কারের ফল মাত্র। উহার অন্য কোন অর্থ নাই। আমরা উলঙ্গ থাকা একান্তই দূষণীয় জ্ঞান করি; কিন্তু এরূপ অনেক স্থান আছে, যেখানে উলঙ্গ থাকা কেহই দোষাবহ মনে করে না। বহু নীতি ও প্রথা, সংস্কার দ্বারা নিয়মিত সন্দেহ নাই। সংস্কার বশতই একই বিষয়ে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়; এবং পাপ-পুণ্যেরও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ও বিচার তদনুসারেই হইয়া থাকে।

কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সংস্কার অবহেলার সামগ্রী নহে। সমক্ষভাবে অন্তর্জ্জগৎ এবং একটু নেপথ্যভাবে বহির্জ্জগৎ সংস্কারের স্রষ্টা। সংস্কার স্বভাবের বিকৃতি-জনিত অবান্তর উপসর্গ নহে,—স্বভাবজাত ফল। আজ সভ্যজগৎ যে সকল কার্য্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, অথবা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আনন্দে জয়ধ্বনি করে, ইহাকে সংস্কারের ফল জ্ঞানে, তৎসংশ্লিষ্ট বিবেকের কার্য্যকে একটা কথার কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যখন মানবজাতির প্রথম অবস্থা, তখন সংস্কারের প্রথম সূত্রপাত হইল কোথা হইতে, কিরূপে? তখন অন্তরস্থিত স্বাভাবিক উপাদান, আর বাহ্য-প্রকৃতি ব্যতি-

রেকে তাহাদিগের পক্ষে ভাল মন্দ নির্ব্বাচনের অন্য কোন উপকরণ ছিল কি ? বাহ্য-প্রকৃতি তাহার অনুমোদিত নিয়মের সঙ্গে বনি-বনাও না হইলেই নেপথ্য হইতে, নীরবে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া, ভুল দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষ তাহা দেখিয়া প্রকৃত পথ চিনিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছে। এদিকে জগন্নিয়ন্তা মঙ্গলময়ের কৃপায় তাহার অন্তরস্থিত প্রবরাত্মার বীজ ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া, উহার স্বভাবসিদ্ধ প্রণোদনায় সত্যের প্রকৃত পথ নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই সংস্কার উৎপত্তির আদি হেতু বা মূলকারণ। প্রবরাত্মাসম্ভূত উচ্চতর বৃত্তিগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীনগতি ও প্রকৃতির অবস্থার বিচারই বিবেক। এই বিবেককেই আমরা সংস্কারের জনয়িতা-রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া পারিতেছি না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যে সংস্কার বা instinct এর কথা বলিয়াছি,. সেই স্বাভাবিক সংস্কার আব এই স্বভাবের বশে বিবেক-সৃষ্ট সংস্কার, এক কথা নহে। সে সংস্কার পশু-চারণের পাঁচনি, আর এই সংস্কার মানব-শোধিনী ভগবদ্-বাণী। ✓

মর্ত্ত্যধামে, সংসার-আশ্রমে, সাংসারিক হিসাবে, প্রকৃত সুখ, সকলগুলি চিত্ত-বৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধানে। বৃত্তিগুলিরভিতরে যেটিকে যখন, সমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অন্যায়রূপে প্রশ্রয় পাইতে অথবা অসংযতভাবে চলিতে দিবে, তখন সেটিই, আপাত-মধুর বোধ হইলেও, ক্ষণকাল পরেই, তোমাকে বৃশ্চিকবৎ দংশনে জ্বালাতন করিয়া তুলিবে।

মানবীয় জীবনের এই মধ্যস্তরে, মানুষের প্রাণে প্রবরাত্মা ও অবরাত্মার প্রভাব সমভাবে পরিস্ফুরিত হয়। উন্নতির এই স্তরে অবস্থিত মানব যখন প্রকাশ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে কাহারও ভিতরে অবরাত্মার প্রভাব প্রদর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে প্রবরাত্মার ভাব জাগরূক হইয়া বিবেকের তাড়নায়, অনুতাপের প্রতপ্ত কশাঘাতে, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে উৎসুক হইয়া উঠে। এই স্তরে মানুষ যেমন আপনার জন্য ভাবে, তেমন পরের জন্যও ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। স্বার্থ-চিন্তা ক্ষণ-ভঙ্গুর অস্থি-মাংসের পিঞ্জর-রুদ্ধ মানুষের পক্ষে প্রায় সকল অবস্থায়ই অপরিহার্য্য। প্রথমতঃ আত্মস্বার্থ, তারপর অন্যের স্বার্থ। মানুষ যতই সোপানের পর সোপানে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহার স্বার্থের সহিত অন্যের স্বার্থ জড়িত এবং স্বার্থের পরিধি ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। সে প্রথমতঃ শুধুই আপনার ব্যক্তিনিষ্ঠ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ খুঁজিয়া ফিরে, এবং এই স্বার্থ উদ্ধারে অন্যের স্বার্থ থাকুক বা যাউক, তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করে না। আর একটু উপরে উঠিলে, সে যেমন নিজের স্বার্থ দেখে, তেমন পরের যাহাতে স্বার্থহানি না ঘটে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া চলে এবং আরও একটু উপরে উঠিলে, যেমন আপনার ইষ্ট অন্বেষণ করে, তেমন পরের ইষ্ট কিসে হইবে, তাহাও সে ষোড়শোপচারে খুঁজিয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত হয়। তাহার স্বার্থ ও অন্য দশজনের স্বার্থ যখন একই থাকে, তখন ত আর কথাই নাই। তাহার স্বার্থের সহিত যখন পরকীয় স্বার্থের কোনরূপ

সংঘর্ষণের সম্ভাবনা না রহে, তখন সে প্রকৃতই একটু শান্তির সহিতই আত্মস্বার্থের অনুসরণে সমর্থ হইয়া থাকে। আত্ম-শক্তির প্রয়োগে অন্যকে নিপীড়িত ও পরাজিত করিয়া, অনুচিত ও অসঙ্গত উপায়ে লব্ধ স্বার্থ-সম্ভোগে, যখন আর মানুষের চিত্ত একেবারেই অগ্রসর হইতে চাহে না, তখনই সে জীবনের উর্দ্ধস্থ স্তরে আরূঢ় হয়। লোকের প্রাণে এই ভাবের প্রাবল্য ঘটিলে, চারিদিকে ন্যায়ের ডঙ্কা বাজিয়া উঠে, সমাজে ধর্ম্মের মহিমা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সভ্য জগৎ এক্ষণ মানবীয় উন্নতির মধ্যম স্তরে অবস্থিত। একদিকে প্রবরাত্মার দেব-প্রভাব, অন্যদিকে অবরাত্মার দানব-নৃত্য। কিন্তু প্রবর ও অবর উভয়েই কিঞ্চিন্মাত্রায় উভয়ের মুখাপেক্ষী। প্রবরের প্রতাপে অবরের গতি একবারে রুদ্ধ না হইলেও, শৃঙ্খলিত ও সংযত। আবার অবরের স্বেচ্ছাচারে প্রবরের বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, প্রবর অবরের অনুরোধ উল্লঙ্ঘনে অসম্মত। প্রবর অবরের মুখে লাগাম লাগাইয়া উহাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতেছে। অবরও আবার প্রবরের প্লাবন-পথে আলি বাঁধিয়া, আপনার ফসল পাকাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। মধ্যম স্তরের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানবীয় উন্নতির অবশ্যই ইহা অপেক্ষাও উর্দ্ধতর স্তর আছে। মঙ্গলময় অনন্তদেবের মঙ্গলরাজ্যে এখনও সে উন্নত স্তরের ভিত্তি স্থাপন ও গঠন আরব্ধ হয় নাই, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না; এমন কল্পনাও আমাদের মতে মূর্খতা।

উপযুক্ত উপাদান-সংযোগে সে স্তর ক্রমেই সুগঠিত হইতেছে। যদিও মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষ অবরাত্মার দুর্ব্বহ বোঝা স্কন্ধে লইয়া, এখনও সে সোপানে পদার্পণ করিতে সাহসী বা সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু একদিন তাহা হইবে। অবরাত্মার ভারে যত কমিয়া আসিবে, উদ্ধারোহণেও ততই তাহার শক্তি জন্মিবে। কিন্তু মানবজাতির সেই শুভ-সুপ্রভাত কবে হইবে? বস্তুতঃ সে সুদিনের সুদূর ব্যবধান আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের মনোবুদ্ধির অগম্য।

মানবের প্রাণে প্রবরাত্মার যতই প্রাবল্য ঘটিবে, সে ততই আপনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা ভাবিতে অধিকতর অভ্যস্ত হইবে। ততই অবরাত্মার বৃত্তিগুলি নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া আসিবে। জাতিগত ভাবে ইহা এখনও সংঘটিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, সময় সময়, এই লক্ষণের পূর্ণ বিকাশ না ঘটিতেছে, এমন নহে। কোন মানুষের প্রাণে বিশ্বনিয়ন্তার কি গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, জানি না, এক এক সময়, দেখা যায়, অবরাত্মার ভাবসমূহ ক্রমে বিশুষ্ক ও নির্জীব হইয়া পড়ে ও প্রবরাত্মার বৃত্তিগুলি প্লাবন-বেগে উছলিয়া উঠে। এই অবস্থা ঘটিলে, সে মানুষ আর মানুষ রহে না, মানব-দেহেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেব-পদবী লাভ করে। তখন আর তাহার নিজের জন্য চিন্তা থাকে না, জগতের দুঃখ দূর করাই তখন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণটা যেন স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া, জগৎ যুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার নিমিত্ত অধীর

হইয়া উঠে। তখনই সে একবার বুদ্ধদেবের ন্যায়, পিতার অপার রাজ-বৈভবকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া, গোপার মত অশেষ গুণালঙ্কৃতা পতি-প্রাণা ও রূপবতী যুবতী পত্নী এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় অপত্যে উপেক্ষা দেখাইয়া, জগতের দুঃখ মোচনার্থ সত্যের পথ খুঁজিতে গৃহ হইতে বহির্গত হয়; অথবা খৃষ্টের ন্যায় ক্রুশ-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া, যে দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য ও ভীষণ নিষ্ঠুরতা হইতে তদীয় পার্থিব তনুর অমন শোচনীয় পরিণাম, ভগবান্ সেই অজ্ঞদিগের অজ্ঞতামূলক অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকেও তাঁহার করুণ-ক্রোড়ে স্থানদান করুন, এই বলিয়া নয়ন-জলে ভাসিয়া ভাসিয়া জগৎ-পিতা করুণাময়ের পাদ-পদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কখনও সে আত্ম-ত্যাগের অচিন্তিতপূর্ব্ব অলৌকিক বিগ্রহ অযোধ্যার সেই দুঃখদগ্ধ রাম সাজিয়া প্রকৃতি-রঞ্জনরূপ রাজধর্ম্ম পালনার্থ প্রাণাধিকা জানকীকে বনে বিসর্জ্জন দেয়; কখনও দধীচি হইয়া দেবজগতের হিত-কামনায় আপনার মর্ম্মাস্থি উৎসর্গ করে; এবং কখনও বা পরের মঙ্গলে অগস্ত্য-যাত্রা করিয়া জীবনে ধন্য হয়। মানুষ যখন ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার সুখ ও জগতের সুখ, এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। তখন সে সর্ব্বতোভাবেই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগী অথবা ত্যাগ-ধর্ম্মী সন্ন্যাসী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবীয় সভ্যতার এই মধ্যযুগে, এই শ্রেণীর মানুষ বা দেব-পুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে পদধূলি-দানে কৃতার্থ করেন বলিয়াই,

পৃথিবী এখনও বাসযোগ্য এবং সময় সময় দেব-নিবাস নামে সংপূজিত।

সমগ্র মানবজাতি বা সভ্যজগৎ যখন বর্ত্তমান মধ্যম স্তর হইতে উত্থিত হইয়া, উন্নতির তৃতীয় স্তরে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এই পৃথিবীর ভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আগে ছিল পৃথিবী অরণ্যময়; মানুষের বাসগৃহ—বৃক্ষ-কোটর বা পর্ব্বত-গহ্বর; নৈশ-আলোক, ওষধির নৈশ-জ্যোতিঃ বা আকাশের চন্দ্র তারা; ভোগ্য গাছের ফল, মূল ও বন্যপশুর অপক্ক মাংস; এবং ন্যায়দণ্ড—বাহুবল। মানবজাতির নিম্ন-স্তর হইতে মধ্য-স্তরে আরোহণের পর, যেমন এই ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—অর্থাৎ পৃথিবীর অরণ্য, নগর, উপনগর, বন্দর, গ্রাম ও পল্লীতে পরিণত, রাজপথ বিদ্যুৎ আলোকে উদ্ভাসিত, বাস-কোটর বা বাস-গহ্বরের স্থানে প্রাসাদশ্রেণী বা হর্ম্ম্যমালা কর্ত্তৃক অধিকৃত,-আহার্য্য, অপক্ক ফল ও মাংসের পরিবর্ত্তে উপাদেয় দেব-ভোগ্য অন্নে পর্য্যবসিত এবং ন্যায়দণ্ড, বাহুবলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি ও জ্ঞান-বলে পরিচালিত হইয়াছে; মানবজাতির তৃতীয় স্তরে অভ্যুত্থান ঘটিলে, এক্ষণকার এই অবস্থাও আবার তেমনই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তখন এক্ষণকার এই মানবধাম—পৃথিবী, অমরধাম— স্বর্গে পরিণত হইবে। পৃথিবীর সমস্ত কুরুক্ষেত্র নীরব হইবে, কামান গর্জ্জিবে না, অসি আস্ফালিত হইবে না, বন্দুকের মুখ বন্ধ হইয়া

যাইবে, সঙ্গীন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ফাঁসী-কাষ্ঠ রন্ধনের ইন্ধন, কারাগার শিক্ষা-নিকেতন এবং বাদ প্রতিবাদের ধর্ম্মাধিকরণ, করুণাশ্রুসিক্ত ন্যায়ের পীঠস্থান হইয়া বসিবে। দস্যু-তস্কর বিলুপ্ত, অত্যাচার উৎপীড়নের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত অভিধান হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে। অভিমানের বিষদন্ত উৎপাটিত হইবে। গর্ব্ব স্ফীত হইবে না, অহঙ্কার তাহার হুঙ্কার-গাণ্ডীবে টঙ্কার দিতে ভুলিয়া যাইবে। ক্রোধ মাথা তুলিবে না; জ্ঞান-গরুড়ের নিশ্বাসে হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষ্যার নাগ-পাশ, মানব-হৃদয় হইতে আপনি খসিয়া পড়িবে।

প্রেমের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। প্রেম-সাগর-বক্ষে তরঙ্গ খেলাইবে। নদী প্রেমের কল-কল নাদে বহিয়া যাইবে। সরোবরে প্রেমের পদ্ম ফুটিবে। বন-বিহঙ্গ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, কল-কূজনে প্রেমের গীত গাইবে। প্রেমের সৌরভ লইয়া সমীরণ প্রবাহিত হইবে। প্রেমের অমিয়-স্পর্শে অনলের জ্বালাময়ী করাল-শিখাও শীতল হইয়া যাইবে। মরুর কণ্ঠে প্রেমের পারিজাতমালা দোলায়িত হইবে। পার্থিব সলিলের নক্র, কুম্ভীর, মৎস্যের সহিত প্রেমে মিশিয়া খেলা করিবে। ব্যাঘ্র, ভল্লুকও হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া শান্ত নিরীহ জীবন যাপন করিতে শিখিবে। তখন ভক্তি, দয়া ও প্রেমই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম এবং পার্থিব জীবনের অদ্বিতীয় নিয়ামক হইয়া রহিবে। পৃথিবীর ভাগ্যে

এমন শুভদিন, পৃথিবীর পক্ষে এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, সশরীরে স্বর্গারোহণ কখনও ঘটিবে কি?

মানবীয় উন্নতির আরও একটি স্তর আছে। উহাই জীবনের উচ্চতম স্তর। জীবনের তৃতীয় স্তরে উন্নত মানুষ বা মনুষ্যরূপী দেবতা তখন আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। মানবীয় প্রাণের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ভাব নিঃশেষে বিলুপ্ত—সুতরাং মানবপ্রাণ ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তাহার তখনকার সেই 'পরমানন্দময় অমৃত' অবস্থাকেই আমরা জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞানে ভক্তি-ভাবে নমস্কার করি। ইহাই মানবীয় উন্নতির চরম বা চতুর্থ স্তর।

ভাগ্যক্রমে অর্থাৎ সঞ্চিত পুণ্য-ফলে যিনি এই গ্রামে আরোহণ করিতে সক্ষম হন, তাঁহার প্রাণে 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভূতি অবিশ্রান্ত লাগিয়া থাকে। তখন পার্থিব গণনার 'আমি—আমার' এই শ্রেণীর ভেদসূচক ভাব ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ সর্ব্বোতোভাবেই আমিত্ব-বর্জ্জিত। সুতরাং 'আমি' এই জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া, একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মে যাইয়া অবগাহন করে। ইহারই নাম মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা কৈবল্য। ইহাই আমাদিগের বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ-সঙ্কুল অবস্থার অতীত, ত্রিগুণাতীত, সেই জগৎ-পূজ্য বেদান্ত-বর্ণিত,—নির্ভয়, অদ্বয়, আনন্দ, ঘন, নিত্য, একরস ও নির্ব্বিকার অবস্থা। তখন বিশ্ব

মিথ্যা এবং বিশ্বাধার সেই চৈতন্যই একমাত্র সত্যারূপে প্রতীয়মান হয় এবং আত্মাও 'রসো বৈসঃ' বলিয়া যাঁহাকে জানে, তাঁহাতেই বিলীন হইয়া, তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রহে।

পার্থিব-দেহে অবস্থিত রহিয়া, এই চতুর্থ বা চরম স্তরে উত্থান মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কিনা জানি না। বর্ত্তমান মধ্যম স্তরে অবস্থিত দেহবিশিষ্ট মানবদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ কেহ এই পথে যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে না পারিয়াছেন, এমন কথা নহে। কিন্তু যখন যিনিই এই পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই তখন বর্ত্তমান অবস্থার সংসার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায়, সমগ্র মানবজাতিরূপ বিরাট্ পুরুষের পক্ষে জড়দেহেই অমর ঐশ্বর্য্যে বিলসিত হইয়া এই চরম স্তরে আরোহণ কখনও সম্ভবপর হইবে কি? যদি এই অসম্ভব কখনও সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তখন ইহলোক ও পরলোক একই হইয়া যাইবে। পৃথিবী আর ভূলোক থাকিবে না, সূক্ষ্ম অজড়-কান্তিতে স্বর্গের অঙ্গীভূত হইয়া রহিবে। অবস্থা এরূপ হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত ভয়াবহ মৃত্যুও আর সে মৃত্যু থাকিবে না; মৃত্যুর নাম হইবে, আনন্দ-প্রদ জন্ম এবং এখনকার জন্মের নামান্তর হইবে, জ্বালা-করাল নরকানলের কোলে আতঙ্কজনক মৃত্যু।

সমাপ্ত।

